নব প্রবন্ধ।

ময়মনসিংহ জজ আদালতের উকীল

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

Calcutta

PRINTED AND PUBLISHED BY JADAV CHANDRA LAHIRI,
AT THE BHARAT MIHIR PRESS
46, PANCHANAN TALA LANE

১২৯২

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ভীষ্মদেব	১
শাক্যসিংহ	১৬
নওশেরার সংগ্রাম	৩০
ভারতে আশা	৩৬
পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার	৪৬
কি এবং কেন	৫৮
নৈশ-নিসর্গ	৮২
চিতোর নগরী	৯৮
ভিক্ষা বৃত্তি	১০৯
পরিশিষ্ট	১১৮

নব প্রবন্ধ।

ভীষ্মদেব।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে যখন ভারতের রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্রবর্গ এক মহাসভায় সমবেত হন, অমিতপরাক্রম যোদ্ধৃবর্গের সগর্ব্বপাদক্ষেপে যখন বসুধা কম্পিতা হইয়া উঠেন, সুদূরদর্শী দেবর্ষি নারদ তখন বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এই যে তরঙ্গায়িত মহার্ণবের ন্যায় ভারতের সমগ্র বীরত্ব সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিতেছ, অতি অল্পকাল মধ্যে কুরুক্ষেত্রে এক ভীষণ সংগ্রাম হইয়া এ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সেই কালসমরে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী ও পরাক্রম একবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।" ধার্ম্মিকবর ব্যাসদেব তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন হৃদয়ের কঠোর শোকভার প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভীষ্মচরিত বর্ণন করিতে সেই শোচনীয় বাক্য গুলিন এবং সেই মর্ম্মস্পর্শি-দীর্ঘনিশ্বাস, স্বজনাদি বিরহিত সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্যের পূর্ব্বস্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে জাগরিত হইল।

আতশবাজির অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভারতের বীর্য্য ও পরাক্রম কুরুপাণ্ডবের ভীষণ আহবে অনন্ত আকাশে মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া এখনও এদেশে অতি গৌরবের বস্তু,—অন্যান্য মহাতীর্থের ন্যায় বীরত্বের সমাধিমন্দির কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান এক মহাতীর্থ স্থান। যে ভূমিতে প্রথমতঃ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গজাশ্বরথসম্বলিত হইয়া যুঝিয়াছিল, যে স্থানে অমানিশার তম-

সান্দ্র ঘনাবৃত আকাশের শেষ নক্ষত্রের ন্যায় পৃথ্বীরাজ আপন জীবনের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ যবন হস্তে সম্প্রদান করেন; যে স্থলে পাঠান বংশীয় ইব্রাহিমলোদি মোগলরণে পরাভূত হন, যেখানে আকবরসাহ হিমুকে পরাস্ত করিয়া আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন; যে স্থলে হতভাগ্য হিন্দুদিগের বৈজয়ন্তী আমেদ সাহ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হয়; আর যাহার অনতিদূরে ব্রিটনীয ভারতবর্ষে রাজসূয়ের মহাসভায় ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ-রাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারতে আপন রাজশ্রীর গৌরব বিস্তার করিয়াছেন, সেই শতধার্ম্মপলি সমতুল্য, মহাবিস্তৃত মহাক্ষেত্রের প্রথ-মাভিনযে দুর্দ্ধারপরাক্রম ভীষ্ম সর্ব্বপ্রধান বীর ছিলেন। কবি, পার্থকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে এবং তাঁহাকে সর্ব্বোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে যত কেন চেষ্টা না করুন তাঁহার সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই লেখনীতে শান্তনুতনযের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রেই ভীষ্ম ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র এবং ভারতের মূর্ত্তিমান বীরধর্ম্ম।

রাজ্যলোলুপ বীরগণ স্বজনাদির সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক শোণিত-সিক্তপদে সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু উদারপ্রকৃতি ভীষ্ম, কর-প্রাপ্ত বিপুল সাম্রাজ্য তুচ্ছ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় ফেলিযা দিযাছেন। যখন দেখিলেন, মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না, পিতার সন্তোষ সাধনার্থ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনের মধ্যে এক দিনও রাজ্যলালসা করিবেন না; সত্যবতীর গর্ভজ সন্তান রাজা হইলে অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবেন না। এই অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থোৎসর্গে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াই বিরত হন নাই, তাঁহার প্রশস্ত হৃদযে ক্ষণে-কের জন্যও যে তজ্জন্য অনুতাপ হয নাই, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অসন্তোষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ প্রকৃতি-সুলভ দোষসমূহে মুহূর্ত্ত জন্যও যে সেই অনাবিল হৃদযসরসী কলঙ্কিত হয নাই, কার্য্যতঃ তাহা উত্তম রূপে দেখাইযাছেন। কাশীরাজতনয়াগণের স্বয়ম্বর সভাসীন নৃপবর্গকে পরাস্ত

করিয়া আপন ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিলেন। বৈমাত্রেয় দ্বয় অল্প কাল মধ্যে কালসদনে গমন করিল; তখনও ভীষ্ম-হৃদয়ে রাজ্যলালসার উদয় হইল না, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জন্য রাজ্য রক্ষিত হইল।

যাঁহারা রাজনীতির কূট প্রশ্ন সকল নিয়ত আন্দোলনে জীবন অতিবাহন করেন, তাঁহাদের যত কেন বীরত্ব থাকুক না, হৃদয় যত কেন প্রশস্ত না হউক, স্বার্থচিন্তায় তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ অতি অল্প দিনেই সঙ্কুচিত ও কুটিল হইয়া পড়ে। কিন্তু মহারথী ভীষ্ম সেই সার্ব্বভৌম নিয়মের অন্তর্ভূত ছিলেন না। তিনি রাজনীতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার উপদেশানুসারে সম্পাদিত যুধিষ্ঠিরের রাজ্য শাসন প্রসিদ্ধ আছে।

রাজনীতির সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী বাসুদেব ভীষ্মকে বিলক্ষণ জানিতেন, ভীষ্মও বাসুদেবকে যার পর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং যুদ্ধকুশল বীরদ্বয় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যেমন একে অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাক্রমণ জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, তাঁহাদের সেরূপ থাকিতে হয় নাই। দৈবকেয় আপনার অসাধারণ বুদ্ধিচক্রে সমস্ত ভারতবর্ষ আবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু ভীষ্মের জ্ঞান গৌরব এবং অলৌকিক শৌর্য্যের নিকট সেই চক্রের অবিরাম গতিও থামিয়া যাইত। যে কালযুদ্ধে চেদীশ্বর মহারাজ শিশুপাল কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীষ্মদেব অসামান্য ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিশুপালের অন্যায় প্রদর্শন করেন, যিনি একবার সাবধানে তাহা পাঠ করিবেন তিনিই ভীষ্মের জ্ঞান গাম্ভীর্য্য ও বাগ্মীতায় মোহিত হইবেন।

বিরাট রাজ্যে অবস্থিতি সময়ে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন এক রথে দুর্য্যোধন ও তাঁহার সঙ্গীয় যোদ্ধৃগণকে পরাভূত করেন, মহাভাগ ভীষ্ম তখন পাণ্ডবগণকে দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সঙ্গে গমন

করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের কোমল ভাব এক বারে উথলিয়া উঠিল। হিমাচলের পাদদেশে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় পাষাণ তুল্য বীরের স্নেহ উৎস উচ্ছ্বসিত ও প্রবাহিত হইল। সব্যসাচী আর্দ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন পিতামহের কাচ-স্বচ্ছ হৃদয়াকাশ কোটি নক্ষত্রসজ্জিত, পবিত্র ও নির্ম্মল। বুঝিলেন, সে আকাশ ক্ষণমাত্রও মেঘাবৃত থাকে না, রণক্ষেত্রের ভীষণ গর্জ্জন ভিন্ন তাহা হইতে অশনি নিনাদও শ্রুত হয় না, তথাপি স্নেহাধারগণের পিপাসার্ত্ত হৃদয় শীতল করিতে পবিত্র বারি সর্ব্বদাই বর্ষিতে পারে।

কবি, ভীষ্মচরিত্র বর্ণন করিতে শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যেমন জগৎদুর্লভ চরিত্র তেমনই অতুল্য বর্ণনা,—উভয়ে উভয়ের প্রতিযোগী হইয়াই যেন চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে। পৃথিবীর কোন কবি, কোন পুরাবৃত্ত লেখক, কোন চিত্রকর এরূপ চিত্র প্রদান করিতে পারেন নাই। ব্যাসদেবের লেখনীতে ভয়ঙ্কর ও মনোহরের আশ্চর্য্য সমাবেশ ভীষ্মচরিত্রে এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই বিশাল সমুদ্রের অশনি ও অমৃত যুগপৎ উৎপাদন শক্তিতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। একবার, দাম্পত্য প্রণয়ের কুসুমকোমলতা নাই দেখিয়া যে হৃদয় মরুভূমির ন্যায় নীরস বালুকাপূর্ণ বোধ হয়, শত্রুর শোণিতস্রোতে রঙ্গভূমি কর্দ্দমিত করিতে দেখিয়া যাহা নিতান্ত নির্ম্মম বলিয়া অন্তঃকরণে ধারণা হইতে পারে, আবার পরক্ষণে আশ্রিত, বিপন্ন, রুগ্ন, স্নেহাধারগণের প্রতি সেই হৃদয় হইতে দয়ার স্রোত মন্দাকিনীর স্রোতের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল ও অবিরাম গতিতে প্রবাহিত দেখিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। শান্তিরসপূর্ণ শান্তনুতনয়ের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর উপদেশ গুলিতে শ্যামল শস্যশোভিত ক্ষেত্রের নয়নতৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য ও বসন্তের কুসুম সুষমা বা নিদাঘের পবনমাধুর্য্য প্রভৃতির ন্যায় তৃপ্তি ও সন্তোষ যুগপৎ উৎপাদন করে। ভীষ্মচরিত্র অঙ্কিত করিতে ব্যাস-,

দেবের ন্যায় কবিও সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে যে উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। প্রথমতঃ দেবোপম কয়েকটী চরিত্র অঙ্কন পূর্ব্বক কাহারও উপর একটী রেখা-পাত, কোনটীর উপর কিঞ্চিৎ কালিমা নিক্ষেপ করিয়া সকলকেই ভীষ্মের ছায়ায় ফেলিয়াছেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলিলেন, পঞ্চপুত্র সহ নিষাদিনীকে দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্র ভীষ্মের ছায়ায় পড়িয়া গেল। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন সারল্য প্রভৃতি গুণনিচয়ে অতুল্য, তিনি যথার্থ ক্ষত্রিয়, তাঁহার চরিত্র কবি এবং পাঠকগণের অতি প্রিয়। যখন বিপক্ষ প্রযুক্ত অমোঘ প্রস্রবণ অগ্নিতেজে ধাবিত হইল; সেই অমোঘাস্ত্র ভীষণারাবে দশদিক পূর্ণ করিল, কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না, বাসুদেবের পরামর্শে অর্জ্জুনাদি বীরগণ একে একে সকলেই শত্রুকে পৃষ্ঠ দর্শন করাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন; ভীমসেন তখনও ক্ষত্রিয়, তখনও অটল। কৃষ্ণ তাঁহাকে আপন শরীরে আবরণ পূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। সেই ভীমসেনও বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক গুণনিচয়ে ভীষ্মের ছায়ায় রহিয়াছেন। শারীরিক শক্তিতেও ভীষ্ম ভীম হইতে ভীষণতর। যিনি সুরলোকে অসুরনাশে বাসবের সাহায্য করিয়াছিলেন, কিরাতরূপী পশুপতিকে যুদ্ধদানে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত নামক মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার অব্যর্থ প্রতাপে খাণ্ডব বন দগ্ধ হয়, কৌরবগণ পরাস্ত হয়, যিনি একক ভীষ্মকে যুদ্ধ দানে সমর্থ ছিলেন, সেই পার্থও একবার শত্রুকে পৃষ্ঠ দর্শন করান, তাঁহার সকল চেষ্টা ভীষ্মের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়।

দেবসেনাপতি স্কন্দের ন্যায় মহাবাহু ভীষ্মও সমরশাস্ত্রে অদ্বিতীয়। কার্ত্তিকেয় যেমন অসুর নাশে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবলোকে প্রসিদ্ধ, ভীষ্মও সেইরূপ নরলোকে প্রতাপ প্রদর্শনে বিখ্যাত। সত্য ও প্রতিজ্ঞা পালন তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল, সেই গুণেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা" এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র শরীর রোমা-

স্খিত হয়, তৎক্ষণাৎ মনে হয় ইহা অব্যর্থ। শাস্ত্র প্রণেতা মনু যুদ্ধ বিষয়ে যে সনাতন নিয়ম গুলি লিখিয়াছেন, ভীষ্ম ব্যতীত আর কোথাও সেই সমস্ত অবিকল পালিত হইতে দেখা যায় নাই। তিনি অমঙ্গল দেখিলে যুদ্ধ করিতেন না। যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ দর্শন করাইত, যে রুগ্ন অথবা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় নাই, যে নিরস্ত্র, ক্লীব বা বিকলাঙ্গ; আপনি রথারোহী থাকার সময় যে ব্যক্তি মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান, যে ব্যক্তি শয়ান, শরণাগত, ভীত বা পলাইত, যাহার অল্পশক্তি, যাহাতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নাই এরূপ কাহাকেও আক্রমণ করিতেন না। আপন পরাক্রমে বিশ্বাস থাকাতে সিংহ যেমন শিকারে মহত্ত্ব প্রদর্শন করে, বীরেন্দ্র-কেশরী ভীষ্মও সমরে আপনি আপনাকে জানিতেন সুতরাং সর্ব্বদাই মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি কখনও অন্যায় যুদ্ধ করেন নাই; কূটযুদ্ধ-প্রিয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল এবং পাণ্ডব-গণের যে হিত কামনা করিতেন, এই অধর্ম্মাচরণের প্রতি ঘৃণাই তাহার এক মাত্র কারণ। যে নৃশংস যুদ্ধে দ্রোণকর্ণাদি সপ্তরথী বালক অভিম-ন্যুকে বেষ্টন করিলেন, অর্জ্জুন-তনয়, সিংহের ন্যায় পরাক্রমে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনেক সৈন্য তাঁহার পরাক্রম প্রভাবে হত হইল; কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে বিপক্ষগণ তাঁহাকে বীর্য্যহীন করিয়া ফেলিল দেখিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে দেবোপম পিতাকে আহ্বান করিতে লাগিল, হৃদয়-বিহীন যোদ্ধৃগণ সেই হৃদয়-বিদারক শব্দ শুনিয়াও শুনিল না। বালক হত হইলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ধর্ম্ম-নিষ্ঠ শান্তনুতনয় সে যুদ্ধে ছিলেন না, সেই লোমহর্ষণ ঘটনা শ্রবণে দুর্য্যো-ধনাদির প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এ স্থলে তাহা বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

ভীষ্ম মধ্যস্থ থাকিবেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, এই তাঁহার বাসনা ছিল। যাহাতে কুরুসংগ্রাম না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টারও ক্রটি করেন নাই। কিন্তু বিধাতৃ-বিধান অনতিবর্ত্তনীয়, "যে দুর্য্যোধন

বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে সূচীকা সুচ্যগ্রে ভেদনোপযুক্ত ভূমির অৰ্দ্ধাংশও বিনা যুদ্ধে দিবেন না বলিয়া কঠোর উত্তরে বাসুদেবকে বিদায় করিলেন, এক দিন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ শক্রহস্তে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন, বীরোদ্যান ভারতের অপূৰ্ব্ব বীরকুসুম সকল কুরু-পাণ্ডবের আত্মদ্রোহ তুষারে নাশ করিয়া ফেলিবে।” ভীষ্মদেব ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় এই মহাবাক্য সংগ্রামের অনেক পূর্ব্বে এবং আপনি শরশয্যায় শয়ান হইয়া পরেও এক বার বলিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানীর উপদেশ উপেক্ষিত হইল; ফল,—আর্য্য-জাতির অধঃপতন, ভারতের সর্ব্বনাশ!

যে দুৰ্দ্ধর্ষ প্রতাপ মহাবাহু ভৃগুনন্দন একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, বসুশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন তাঁহাকেও একবার সমরে পরাস্ত এবং তাঁহার বীরাভিমান চূর্ণ করেন। সমরে তাঁহার সম্মুখীন হয় এমন কেহই ছিল না। একমাত্র অৰ্জ্জুন প্রতিপক্ষ হইয়া কৃতকার্য্য না হউন, যুঝিতে পারেন, ভীষ্মকে সংগ্রামে যোগ দিতে হইলে তাঁহারই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হয়। একদিকে দুৰ্য্যোধনের অনুনয় ও অনুরোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনা, অন্য দিকে বীর প্রতিপক্ষ, সুতরাং ভীষ্ম কুরুপক্ষ না হইয়া পারেন না, তাহাই হইলেন। কুরুক্ষেত্রের কাল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, প্রতিদিন অযুত সৈন্য নাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারতবর্ষের রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্রবর্গ দুই ভাগ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বনাশ ব্যপদেশে আত্ম-বিনাশনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের ভয়াল সংগ্রাম তরঙ্গায়িত সমুদ্রের তটাভিঘাতের ন্যায় নিতান্ত দুৰ্ব্বার হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণের ভীম পরাক্রমে কুরুসৈন্য মর্দ্দিত হইতে লাগিল; দুৰ্য্যোধনের পক্ষে সাহস উৎসাহ রহিল না। তখন সিংহপ্রতাপ মহারথী ভীষ্মের রথ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল, অমনি যেন দৈববলে কুরুপক্ষে সাহস ও স্ফূর্ত্তি এবং পাণ্ডব পক্ষে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম প্রকাশ পাইল। নিদাঘের অশনি নিনাদের

ন্যায় শ্রুতিকঠোর জ্যা-নির্ঘোষে গঙ্গাতনয় সকলের চিত্তে ভীতির উদ্রেক করিলেন। প্রভঞ্জনের উন্মত্ত গতিতে শুষ্ক পত্রাদি যেমন ঘূর্ণিত হইয়া দূর হইতে দূরতর দেশে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ মহারথীর পরাক্রমে শত্রুগণ সেই রঙ্গ-ভূমি হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। এক মাত্র ধনঞ্জয় সেই মহাবাহুর সম্মুখীন হইয়া দশ দিন যুদ্ধ করিলেন, সে যুদ্ধও সমান সমান হইল না। একদিন মাত্র বীরশিশু অভিমন্যু প্রপিতামহ ভীষ্মকে কিয়ৎকাল যুদ্ধ দানে তুষিয়াছিলেন, আর কাহারও সাধ্য হয় নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয় শিষ্য ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য পার্থ সহ যুঝিতে লাগিলেন। লঘুহস্ত সব্যসাচী নিতান্ত সাবধানতার সহিত বাণবর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে ব্যাপৃত রাখিবেন, অযুত-বিনাশন প্রতিজ্ঞা স্খলিত করিবেন, এই তাঁহার চেষ্টা ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কোন দিন ঘর্ম্মসিক্ত ললাট মার্জ্জন সময়ে, কোন দিবস অন্য যোদ্ধার যুদ্ধ কৌশল দেখিতে, কোন দিন বা চক্ষুর নিমেষ মাত্র পরিত্যাগ করিবার অবসরে ভীষ্ম অযুত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন গত হইল, দুর্য্যোধন দেখিলেন, কুরুসৈন্যের নায়ক মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মদেবের ভীম যুদ্ধেও পাণ্ডবগণ মধ্যে কেহ হত হইলেন না; তাঁহাদের পক্ষীয় শ্রেষ্ঠ কোন বীরও রণ শয্যায় শয়ন করিলেন না। তখন খুল্লপিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মনোযোগের ক্রটি আছে বলিয়া অনুযোগ করিলেন। ভীষ্ম কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া পরদিনের যুদ্ধে পঞ্চ বাণে পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন হনন মানসে সায়ক পাঁচটী বাছিয়া রাখিলেন দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। কিন্তু বিধাতৃবিধান অন্যরূপ, শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে বাণ পাঁচটী পাণ্ডবগণের হস্তগত হইল। ভীষ্ম দেখিলেন কোন অনিবার্য্য দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল, বাসুদেবই যে সেই চক্রের মূল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তুষার-শুভ্র ধবল গিরির ন্যায় মহারথী ভীষ্ম

কার্ম্মুক হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, অন্য দিকে মহার্ণবের তরঙ্গের অপ্রতিহত গতির ন্যায় ভীমবেগে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব হস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিকে ভীষ্মের অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা ও বাসুদেবের মন্ত্রণা, এই দুইটীর মধ্যে কোনটী বলবৎ হইবে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। বসুন্ধরায় যেরূপ অভিনয় আর হয় নাই, ইতিহাসের বহুজ্ঞ চক্ষু যাহা দর্শন করে নাই, কবির লেখনী আর যাহা লিখিতে পারে নাই, সেইরূপ কাল-সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দুইদিকে স্তূপাকারে শবরাশি নিপতিত হইয়া শোণিতস্রোতে রণস্থল কর্দ্দমিত করিল। কাহারও বিশ্রাম নাই; অনবরত বাণনিক্ষেপে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, পাঞ্চজন্যাদির প্রলয়রূপ রণবাদ্যে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত। অর্জ্জুনের হস্তে দৈবকবজ, দেব-দত্ত ধনু, পাশুপত মহাস্ত্র; অর্জ্জুনের রথ কপিধ্বজ, সারথি স্বয়ং বাসুদেব; তথাপি ভীষ্মের প্রতাপে অস্থির। পার্থের শরীরে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় সায়ক বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের শরীর বিদ্ধ অস্ত্রে চমকিতশজাকপৃষ্ঠের ন্যায় কণ্টকময় হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য সব্যসাচীর লঘুহস্ত ধীর বোধ হইল; বাণে বাণে চতুর্দ্দিক আবরিত করাতে নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল; আর পথ দেখা গেল না। চতুর্দ্দিক শরজালে আঁধার আঁধার আঁধার করিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে কর্ণ বধির করিল, কৃষ্ণার্জ্জুনের মুখ শুকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণ দেখিলেন অস্ত্র বেদনা সহ্য হয় না, হৃদয়সখা আশ্রিত অর্জ্জুনের ক্লেশ আর সহা যায় না. সখার প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্তরাত্মা যেন আপনা হইতে হু হু শব্দে কাঁদিয়া উঠে। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, আত্ম বিস্মৃতিতে প্রতিজ্ঞা মনে রহিল না, 'কুরুযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না' সঙ্কল্প ভুলিয়া গেলেন, প্রমত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ বেগে লম্ফ দিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় চক্র হস্তে লইয়া ভীষ্মকে লক্ষ্য করিলেন। ইত্যবসরে ভীষ্মদেব দশ সহস্র সৈন্যের বিনাশ সাধন

পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ হইয়াছিলেন ; বাসুদেবের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল দেখিয়া স্মিতমুখ হইলেন। বীর যেমন আপনাকে জানিয়া প্রফুল্ল থাকেন তাঁহার মনও সেইরূপ প্রফুল্ল হইল। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপন পণ স্মরণ পূর্ব্বক লজ্জিত ও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের পরাক্রমে পাণ্ডব-পক্ষে মহাত্রাস উপস্থিত হইল। ভীষ্ম জীবিত থাকিতে যুদ্ধ শেষ হইবে না, জয়ের আশাও নাই, একথা বুদ্ধি-জীবী বাসুদেব বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তাহার পথান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। উদারচেতা মহাপুরুষ ভীষ্ম আপনার মৃত্যুপথ পাণ্ডবগণকে আপনিই বলিয়া দিলেন, ইচ্ছামৃত্যু মহারথী আপন নাম সার্থক করিলেন। প্রাণের জন্য তাঁহার মমতা হইল না, সংসারের মোহ মায়ায় তাঁহাকে বারণ করিল না। তিনি বলিলেন "আমার প্রতিজ্ঞা আছে অমঙ্গল দর্শন করিলে কার্ম্মুক ধারণ করি না। তোমরা দ্রুপদতনয় নপুংসক শিখণ্ডীকে রথোপরি স্থাপন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইও। আমি তখন অস্ত্র ধারণ করিব না। নিরস্ত্র অবস্থায় তোমরা আমাকে আক্রমণ এবং আমার সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ করিও। শরশয্যায় আমার মৃত্যু হইবে।"

অনন্তর তাহাই হইল। অমোঘ প্রতাপ ভীষ্মদেব দশ দিনে লক্ষ সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক আপন প্রতিজ্ঞা পালন করার পর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রথোপরি দণ্ডায়মান হইল, অর্জ্জুন পশ্চাদ্ভাগে রহিলেন। অমঙ্গল দর্শনে ভীষ্ম কোদণ্ড ধারণ করিলেন না। অথচ শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য অচলের ন্যায় রথোপরি দণ্ডায়মান রহিলেন। শিখণ্ডী সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু সে দুর্ব্বল-প্রযুক্ত-অস্ত্র ভীষ্মের অঙ্গাবরণও ভেদ করিল না। তখন পার্থ তাহার পশ্চাৎ হইতে সুতীক্ষ্ণবাণে পিতামহের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তের দেবোপম মূর্ত্তি এবং অলৌকিক,গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ-মুখ-দ্যুতি সন্দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয়ে পিতামহের স্নেহ মমতা,

বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন, জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি সমস্ত জাগরুক হওয়াতে কিছুকাল সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত কম্পিত এবং বংশের চূড়া স্বরূপ পিতামহকে বিনা যুদ্ধে অন্যায় রূপে বধ করিতে বিবেক ও চিত্ত সঙ্কুচিত হইতেছিল। কিন্তু কৃষ্ণের বাক্যকৌশলে সে ভাব রহিল না, নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় সহস্র সহস্র সাযকে ভীষ্মের শরীর বিদীর্ণ করিলেন। ধন্য ধৈর্য্য, ধন্য প্রতিজ্ঞা হস্তদ্বারাও একটী বাণ নিবারণ করিলেন না, অজস্র শোণিত সম্পাতে তাঁহার শরীর অবসন্ন করিযা আনিল। পরিশেষে সেই বীরেন্দ্রকেশরী মহারথী ভীষ্মের শরীর ভূতলে পতিত হইল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল। ভারতবর্ষের গৌরবরবি, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পুরুষ, কুরুবংশের নাযক, ক্ষত্রিযের আদর্শ, অবিচলিত সত্য, স্থির প্রতিজ্ঞা, অতুল্য বীরত্ব, চন্দ্রবংশের চন্দ্র ভীষ্মের সহিত ভূতলে খসিযা পড়িল।

অস্ত্রে অস্ত্রে সমস্ত শরীর কন্টকাকীর্ণ করিযাছিল, শরীর মৃত্তিকাস্পর্শ করিল না শরোপরি দেহ অবস্থিত রহিল। ভোগবতী গঙ্গার পবিত্র সলিল অর্জ্জুন-প্রযুক্ত বাণের সহিত বেগে উত্থিত হইয়া ভীষ্মের তৃষিত ও রুদ্ধ কণ্ঠ শীতল করিতে লাগিল। কুরুপাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিকে সমবেত হইযা শোক দুঃখ অনুতাপে আত্মকৃত পাপের প্রাযশ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম উত্তরাযণ সংক্রান্তিতে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিবেন সে পর্য্যন্ত শরশয্যায শযান রহিলেন।

অন্যে অস্ত্রের একটী মাত্র চিহ্ন সহ্য করিতে পারে না, বেদনায ছটফট করে, স্থির মনে কথাটাও কহিতে পারে না। কিন্তু ভীষ্মের সকলই অলৌকিক, সকলই মহৎ, তিনি শরশয্যায শযন করিযা যুধিষ্ঠিরাদি সকলকে শান্তিময সুধাবাক্যে উপদেশ প্রদান করিতেন। যে অবস্থায জননী সন্তানকে ভুলিযা যান, সংসারের স্নেহ মমতা কিছুই স্মরণ থাকে না, ঈশ্বরের পবিত্র নামটী উচ্চারণেও ক্লেশ অনুভব হয, সেই অবস্থায বসুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক তাহার অমৃত দ্বারা শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি

সাধন করিতেন। শান্তিরসপূর্ণ শান্তিপর্ব্বের উপদেশ গুলিন ভীষ্মের জ্ঞান গৌরবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

দণ্ডীপর্ব্ব বর্ণিত মহাদেবের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ বর্ণনায় অথবা তাঁহার দেবযোনিতে জন্ম এবং অতিমানুষিক কার্য্যাবলি বিবৃত করণে আবশ্যক নাই। ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রই ভীষ্ম এবং ভীষ্মই ভারতের মূর্ত্তিমান বীর ধর্ম্ম এই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এবং ভীষ্ম চরিত্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

যে বহ্বায়ত মহাক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ যুদ্ধে বীরকুল নির্ম্মূল হয় তাহারই নাম কুরুক্ষেত্র। সরোবর পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ রঙ্গভূমিতে মহারথী ভীষ্ম সেই আহবের সর্ব্বপ্রধান বীর। সমরের সূচনায় তিনি রণাঙ্গন প্রবেশ করেন, ভীষ্মান্তে যুদ্ধান্ত হয়। কেবল যুদ্ধ নহে, কুরুকুল নির্ম্মূল এবং ভারতবর্ষ বীর বীর্য্য বিহীন হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে কুরুদিগের তিন জন এবং পাণ্ডবদিগের সাত জন মাত্র অবশিষ্ট থাকে আর সকলে শমন সদনে গমন করে। শান্তনুতনয়ের ঘটনা পূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের শেষাঙ্ক কুরুক্ষেত্রের অভিনয়; —অতি উজ্জ্বল, অতিশয় গৌরবপূর্ণ এবং প্রাতঃস্মরণীয়। কর্ণের বিশ্বাস ছিল, তিনি কুরু সৈন্যের নেতা, সুতরাং ভীষ্মকে বলিলেন, "আপনি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না" এই বলিয়া সৈনাপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীষ্ম অসামান্য যুদ্ধ করিয়া মনুষ্যের শক্তি কি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে রণকৌশলে তাহা দেখাইলেন; শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া কর্ণের সমর ও পতন পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কিন্তু কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইলেন না। তাঁহার অলৌকিক শৌর্য্যের তুলনাও দেখা গেল না। কুরুক্ষেত্র হইতে ভীষ্মকে প্রভেদ কর, এক পার্শ্বে এই দেব চরিত্রটী সরাইয়া রাখ, কুরুক্ষেত্রের কিছুই থাকিবে না। চন্দ্রবংশের মহারণের পূর্ব্বে যেমন শুধু একটী প্রান্তর মাত্র ছিল, ভীষ্ম এবং তাঁহার বীরপণা ও কার্য্য কলাপ

ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলে সেই ক্ষেত্র আবার তাহাই হইবে। কুরুক্ষেত্র এবং ভীষ্ম এতদুভযে পৃথক করা যায় না। আবার যদি কুরুক্ষেত্রের অভিনয় না হইত, রণসজ্জা হইতে আরম্ভ করিযা শরশয্যা পর্য্যন্ত পৃথিবী না দেখিত তবে ভীষ্মের চরিত্র কখনও বিকাশ পাইত না। ভীষ্মের জীবন হইতে কুরুক্ষেত্রের ঘটনা গুলিন স্থানান্তরিত কর, সেই অমূল্য চরিত্রের কয়েকটী অসম্পূর্ণ চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইবে, সুতরাং কুরুক্ষেত্রই ভীষ্ম, ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র।

ভারতভূমিতে সমরাভিনয অনেক হইযাছে; বর্ত্তমান সমযের সুদূরবর্ত্তী রামাযণ মহাভারতের সমযে সমগ্র ভারতবর্ষ একটী যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল বৃত্তান্ত এখন কবির কল্পনা কাব্য ও উপন্যাস বলিযা গৃহীত হয। এ দেশে এখন স্বপ্নেও রণ-ভূমি দেখি না, যে মহাভূমিতে কুরুপাণ্ডবের ভযঙ্কর যুদ্ধ হইযাছিল, এখন যদি একবার স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিযা দেখা যায একটী বিস্তৃত মাঠ ভিন্ন আর কিছু চিহ্নও লক্ষিত হয না। কিন্তু সেই মহাশ্মশানে ভারতবর্ষ বীর্য্যশূন্য ক্ষত্রিযশূন্য করিযা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চিরনিদ্রায নিদ্রিত! সেই পুণ্যভূমিতে মহাবল ভীষ্মদেব শরশয্যায শযান থাকিযা পাপ পৃথ্বী পরিত্যাগ করিযাছেন। ভীমের গদা, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, ভীষ্মের কোদণ্ড প্রভৃতি সমস্ত সেই স্থানে পরীক্ষিত হইযাছে। আর্য্য জাতির দুর্ভাগ্য যে, এই সমস্ত ঘটনার যথাতথ ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হয নাই। যদি চিলিয়ানওযালার ঘটনা না ঘটিত; ভ্রান্তবুদ্ধি অযোধ্যাবাসীগণ কাণপুর প্রভৃতি স্থানে জীবন ব্যযে কৃতকর্ম্মের প্রাযশ্চিত্ত না করিত এবং গ্রান্ট্-ডফ্ ও কর্ণেল টড্ মহারাষ্ট্রীয ও রাজপুতদিগের ইতিহাস সঙ্কলন না করিতেন, তবে এদেশে কোন দিন যে ক্ষত্রিয ছিল এ কথা কেহ বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ।

ক্ষত্রিযের ধর্ম্ম,—ন্যাযযুদ্ধ; পুরস্কার,—মরণে স্বর্গলাভ। মনুবর্ণিত সনাতন নিযমগুলি পালন করিযা যাঁহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম, তাঁহারাই

প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বীর। সেই ন্যায় যুদ্ধ কি, এবং কি প্রথা অবলম্বন করিলে যথার্থ যোদ্ধৃধর্ম্ম রক্ষা হয়, এ বিষয়ে মত-বৈষম্য আছে। এক দিকে চাণক্যচক্রী রাজমন্ত্রীগণ, শত্রুনাশ জয়ের মূল বলিয়া যেরূপেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিতে গুপ্ত মন্ত্রণা প্রদান করেন, অন্যদিকে শান্তিপ্রিয় সুধীগণ ক্ষমা তেজস্বীর তেজ, অহিংসা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় উপদেশ দেন। এই উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধনপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে থাকাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আপনাদিগের অর্থাৎ আপনাদের প্রতিভূ রাজার স্বত্ব ও জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে হইবে, আবার সেই সংগ্রামে বীরপদ্ধতি অতিক্রান্ত না হয় তৎপ্রতিও দৃষ্টি থাকিবে। রাম চরিত্রে দয়ার ভাগ অধিক, কৃষ্ণ চরিত্রে কৌটিল্য ও কাপট্য প্রবল, সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম একমাত্র ভীষ্মে পরিলক্ষিত হয়। ক্ষাত্রধর্ম্মের উপদেশ এই, মৃগের ন্যায় নিরীহ, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত, বালকের ন্যায় সরল, লৌহের ন্যায় কঠিন, সত্যের মত পবিত্র, ন্যায়পরতার তুল্য স্থির, জোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল অথচ সূর্য্যবৎ প্রতাপশালী হইতে হইবে। দয়া ও ক্ষমা উদার প্রকৃতিতে সর্ব্বদা বিরাজ করিবে। বীরদর্শনে ভয় ভীত, আবার ভীত অভয় প্রাপ্ত হইবে। ভীষ্ম ব্যতীত এ সকল গুণ একাধারে আর দেখা যায় না। তিনি সহিষ্ণু, শরশয্যায়ও সুখী, মহাজ্ঞানী, পরম ধার্ম্মিক। ফলতঃ পণ্ডিতগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া যোদ্ধৃগণের যে সকল গুণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, অভিজ্ঞগণ যাহা একাধারে দেখিতে না পাইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন, সে সমস্ত ভীষ্মে বিরাজমান ছিল। ক্ষত্রিয়ের লক্ষণগুলি শরীর ধারণ করিয়া ভীষ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি মূর্ত্তিমান ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম।

নিশীথ সময়ের সুদূরবর্ত্তী গম্ভীর বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় মার্ত্তণ্ড প্রতাপ মহারথী ভীষ্মের নামটী উচ্চারিত হইবামাত্র শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, অমনি তাহার সঙ্গে প্রত্যেক হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতির লহরী ক্রীড়া করিতে থাকে। মহার্ণবের গর্ভ হইতে যেমন অমৃত ও অশনি

উদ্ভবের উৎপত্তি, সুনীল নভোমণ্ডল হইতে যেমন সৌদামিনীর বিশ্ব-বিমোহিনী রূপরাশি এবং বজ্রের কঠোরনিনাদ নির্গত হয়, সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ভীষ্মহৃদয় হইতে তেমনই দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ মমতাদি কুসুম সুকুমার গুণ াশি এবং বীরগৌরব যুগপৎ প্রতিভাত হইত। বিন্ধ্য শৈলের প্রস্তরময়ী,মূর্ত্তির অনতিদূরে নর্ম্মদার রজত-প্রবাহ-বিধৌত শ্যামলক্ষেত্র সকল যেমন নয়ন ও মনের তৃপ্তিপ্রদ, ভীষ্মের চরিত্রের সুকুমারাংশও তদ্রূপ। গম্ভীর গর্জ্জনান্তে বারিবর্ষণে বসুমতী যেমন সুশীতল হয়, অলৌকিক প্রকৃতি মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে শরশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যসুধা স্বজন-বিরহ-বিধুর ব্যক্তিদিগের শোকার্ত্ত হৃদয় তেমনই প্রশমিত ও স্নিগ্ধ করিয়াছিল। যখন কণ্ঠে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছিল, অজস্র-ধারায় শোণিত নির্গত হইয়া শরীর অবসন্ন করিতেছিল, কখনও তাঁহার জ্ঞান-নয়ন অন্ধকার করিতেছিল, তখন সেই নিরুদ্ধকণ্ঠে, নিশ্চল রসনায়, পরাৎ-পর পরমেশ্বরের নাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আর্য্য-জাতির নিতান্ত দুরদৃষ্ট, ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণের দুর্ভাগ্য যে, দেবোপম শান্তনু-তনয়ের জাবনবৃত্ত সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নতুবা আজি এই একটী চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক হিন্দুগণ সগৌরবে সকল জাতির ইতি-হাস বালুকাকণার ন্যায় উপেক্ষা ও ছায়ার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতে পারিতেন। কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, ভারতবর্ষ শকযবনাদি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া অশেষবিধ পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়াছে, কিন্তু মর্ম্মর-গ্রথিত অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় ভীষ্মের অত্যুন্নত চরিত্র অসম্পন্ন ইতিহাসের ক্ষাণালোকে প্রতিফলিত হইয়া অদ্যাপি প্রত্যেক হিন্দুর নয়নপথে বিচরণ করিতেছে, হিন্দুগৌরবের শেষ বস্তু ভীষ্ম নাম, হিন্দুদিগের কীর্ত্তি-স্তম্ভ গাঙ্গেয় নাম।

কুরুসংগ্রামের অবসানে অবশিষ্ট বীর কয় জন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব মহাপ্রস্থানে মহাপ্রস্থান করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের

লক্ষ্মী, আর্য্যের শুভাদৃষ্ট সকলই চলিয়াগেল। বিধাতার অজ্ঞেয় শাসনচক্রে সকলই আবর্ত্তন করিবে, কালের কঠোর শাসনে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু সেই যশঃসূর্য্য অস্তমিত হইবে না, সেই পূর্ণিমা কৌমুদীতে অমানিশা ঘটিবে না, সেই অনল ভস্মাবৃত হইবে না।

শাক্যসিংহ।

অতি যত্নের সহিত সুদীর্ঘ জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিলে আমরা যে পরিচয় প্রদান করিব, প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখিত সুধু নামটীই তদপেক্ষা অধিক বলিতে সক্ষম, সুতরাং শাক্যসিংহের জীবনী না লিখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিব। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জীবনের দুই চারিটী ঘটনা ও তৎসম্বন্ধে কিছু মন্তব্য লিখিয়া প্রস্তাব সমাপনে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরে নেপাল রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হিমাচলের পাদদেশে কপিলবাস্তু নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন সেই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি গৌতম বংশীয় শাক্যপরিবারস্থ হওয়াতে লোকে তাঁহাকে গৌতম, কখনও শাক্য গৌতম বলিত। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হওয়াতে তিনি সুপ্রবুদ্ধ রাজদুহিতা রূপবতী সুশীলা মহামায়ার পাণিগ্রহণ করেন। ললনাগণের হৃদয় শিরীষকুসুমরচিত শয্যার ন্যায় অতিশয় কোমল, দয়া প্রভৃতি সুকুমার গুণ সেই নম্র হৃদয়ের অলঙ্কার ; লজ্জার রমণীয় আবরণ সেই নমনীয় অন্তঃকরণের রক্ষক। দেবী মহামায়ারও সেইরূপ ছিল। বরং স্বজাতি-সুলভ সুকুমার গুণরাশি তাঁহাতে কিছু অধিক পরিমাণ ছিল। তিনি যথার্থই মূর্ত্তিমতী মমতা ছিলেন, পরদুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় মন্দাকিনীর স্রোতের ন্যায় একবারে তরল হইয়া পড়িত। তিনি ভক্তি ও ভালবাসার সাহায্যে আপন পতির সংসারবাসনা হ্রাস করিয়া-

ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে মৃগয়া পর্য্যন্তও করিতে দিতেন না। যেমন চন্দনবৃক্ষের সংসর্গে সামান্য বৃক্ষও চন্দন হয়, তেমনই দয়াবতী মহা-মায়ার সহবাসে রাজা দয়াবান্ ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠেন। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ও দৃঢ় হয়। মহাভাগ শাক্যসিংহ সেই প্রণয়বৃক্ষের অমৃত ফল।

বালকের জন্মের অব্যবহিত পরে রাজা একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাঁহার রাশি, নক্ষত্র, অদৃষ্ট-ফল ইত্যাদি গণনা করিতে বলিলেন। তখন প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি বালকের মুখ-মণ্ডলে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিল, প্রশস্ত ললাট দেশে রক্তিমাভ রেখাদ্বয় দেখা যাইতেছিল; পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিলেন, বালক সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হইবে, সে যাহা সঙ্কল্প করিবে তাহাই সংসিদ্ধ হইবে। সুতরাং রাজা পুত্রের এক নাম শাক্যসিংহ অন্য নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। বুদ্ধদেব রণ ভূমিতে সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন নাই সত্য, কিন্তু যে ক্ষেত্রে আপন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অধিকার বিস্তার করি-য়াছেন, তাহা ওয়াটারলু, পাণিপথ হইতেও প্রসিদ্ধ, এবং লব্ধ রাজ্য ইয়োরোপ বা ভারতবর্ষ হইতেও বিস্তৃত।

জন্মের এক সপ্তাহ পর শাক্যসিংহ মাতৃহীন হন। রাজার প্রথম স্ত্রী মহামায়ার ভগ্নী ছিলেন, বালক এক্ষণে সেই মাতৃস্বসার হস্তে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সমর্পিত হইলেন। মাতৃহীন শিশু-গণের ন্যায় তাঁহার স্বভাব বাল্যকাল হইতেই চিন্তাপ্রিয় ও প্রফুল্লতা বিহীন হইল। রাজা তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাদান পূর্ব্বক মানসিক,সুখের দ্বার উন্মোচনে মানসিক প্রফুল্লতা জন্মাইতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। বুদ্ধ অল্পদিন মধ্যে এরূপ উৎ-কৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিলেন যে, সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ শিক্ষকগণ আর কিছু শিখা-ইবার নাই বলিয়া একে একে বিদায় হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনু-

সন্তান বাসনা এত প্রবল এবং প্রশ্ন সকল এরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে, সহসা কেহই তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দানে সাহসী হইত না।

অধ্যয়নাদিতে নিবিষ্ট থাকার উপায় রহিল না দেখিয়া শাক্যসিংহ অরণ্যাদি নিভৃত প্রদেশে গমন পূর্ব্বক মনে মনে কোন উচ্চ বিষয় অনুশীলনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আলোকের অপর পার্শ্বস্থ অন্ধকারের ন্যায় ক্রীড়াসক্ত হাস্যবদন সমবয়স্ক বালকগণ, ম্লানবদন চিন্তা যুক্ত বুদ্ধদেবের সহিত মিশিত না, তিনি একাকীই সময় যাপন করিতেন। রাজা কুমারের এইরূপ নির্জ্জন-প্রিয়তা নিতান্ত অনিষ্ট জনক হইবে, আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিণয় সম্পাদন কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী কুমারকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বিবেচনার জন্য এক সপ্তাহ সময় চাহিলেন। যখন তাঁহার হৃদ্বোধ হইল যে বিবাহ মানসিক চিন্তার কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবেনা, তখন সম্মতি দিলেন।

রাজা দণ্ডপাণির দুহিতা রূপবতী গোপার সহিত পরিণয় প্রস্তাব হইল। দণ্ডপাণি লোক মুখে শুনিয়াছিলেন শাক্যসিংহের শারীরিক কি মানসিক গুণ কিছুই নাই, যুদ্ধবিদ্যায় তিনি নিতান্ত অপটু, সুতরাং তাঁহাকে কন্যা দানে অসম্মত হন। কিন্তু গোপার জননী এবং সমবয়স্কা একটী বালিকা, স্বচক্ষে বুদ্ধকে দেখিয়া পরে অন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করাতে রাজা কপিলবাস্তু রাজধানীতে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকটী সমরকুশল যুবক ছিল। যখন দেখিলেন বুদ্ধ দেবের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যুবকগণ একে একে পরাজিত হইল, তাঁহার শারীরিক সৌষ্ঠবে রূপবান যুবকগণও যেন ছায়ায় পড়িল, তখন আর তাঁহার আপত্তি রহিল না। তাহার সমভিব্যাহারী দুইজন পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে রাজকুমারের নিকট পরাস্ত হইলেন দেখিয়া দণ্ডপাণির কন্যা দানে নিরতিশয় আগ্রহ জন্মিল। তিনি জানিতে না পারিয়া লোকের কথায় এরূপ সম্বন্ধে অসম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিত হইলেন এবং

কপিলবাস্তুর রাজা ও তাঁহার তনয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন "মনুষ্য মনুষ্যকে দুর্ব্বল বা অনুপযুক্ত বিবেচনা করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, মনুষ্য স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, জ্ঞানও অনন্ত। আমার জ্ঞান-গৌরব কিছু নাই, আপনি কোন অপরাধও করেন নাই, ক্ষমা অপরাধের অনুবর্ত্তী, আপনি কেন ক্ষমা প্রার্থনা করেন?" তাঁহার পিতা দণ্ডপাণিকে বৈবাহিক রূপে গ্রহণ করিলেন।

পরিণয় সম্পন্ন হইল, নবদম্পতীর মিলন সুখোৎপাদন করিল; কিন্তু রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ জীবন, মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অনুশীলনে নিরত রহিলেন। তিনি বলিতেন "পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়, কিছুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে যেরূপ অগ্নি উৎপাদিত হয় জীবনও তদ্রূপ,—এই জ্বলিয়া উঠিল, এই নির্ব্বাণ হইল,—কোথা হইতে আসিল কোথায়ই বা চলিয়া গেল আমরা জানিতে পাই না। যেমন বীণার শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইয়া কোথায় লীন হয় দেখা যায় না, জীবনও তদ্রূপ। জ্ঞানীগণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। অবশ্যই এমন কোন শ্রেষ্ঠমনীষা, কোন অনন্ত জ্ঞান বর্ত্তমান আছে যাহাতে আমরা শান্তিলাভ করিতে পারিব। যদি সেই শান্তির বিষয়টী আমি লাভ করিতে পারি, তবে এ বিষয়ে মানবমনে যে গভীর সন্দেহ, গাঢ় অন্ধকার আছে তাহা মোচন করিতে পারিব, যদি আমি স্বয়ং মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করি, সংসারস্থ সকলকে মুক্ত ও স্বাধীন করিব।"

তনয়ের বিষণ্ণতা সন্দর্শনে রাজা নিরতিশয় দুঃখিত থাকিতেন, তাঁহার মনোমালিন্য দূর করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। প্রত্যেক ব্যক্তির নয়নপথে প্রতি দিন শত শত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু সকলেই সে সকল উপেক্ষা করে, কেহ তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করে না। বুদ্ধদেব এইরূপ তিন চারিটী সামান্য ঘটনা হইতে জীবনের গতির যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা

পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার হৃদয় কেমন প্রশস্ত এবং আত্মা কতদূর বিমল ও উন্নত ছিল তাহা সহজে বুঝা যাইবে।

একদা রাজকুমার শকটারোহণে নগরীর পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইযা আপনার একটী উপবনে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী বৃদ্ধ এক পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার শরীর নিতান্ত বীর্য্যহীন ও অবসন্ন, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং মাংস লোলিত হইযাছে। পরিষ্কার ভাবে একটী শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে তাহার একপ ক্ষমতা ছিল না, সমস্ত শরীর করধৃত যষ্টির ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। বুদ্ধদেব শকটবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে? ইহার এ অবস্থা কেন? ইহার পরিবারস্থ সকলেই এইরূপ, না পরিণামে মনুষ্যমাত্রেরই এই দশা ঘটে?"

শকটবান বলিল, "মহাশয়। এই ব্যক্তি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত জরাগ্রস্ত হইযাছে। এক্ষণে ইহার পূর্ব্ববৎ দৈহিক বল কি বুদ্ধি বিবেচনা নাই। ইহার আত্মীয় স্বজনও এক্ষণে ইহাকে ঘৃণা করে। নিতান্ত নিরাশ্রয হওযাতে এ দশা ঘটিযাছে। উদ্যানের কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইযা গেলে লোকে যেমন তাহার আদর করে না, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য হইলে লোকে তাহাকেও তদ্রূপ অবজ্ঞা করে। এই অবস্থা কেবল ইহারই পরিবারে ঘটে না, প্রত্যেক পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির এইপ্রকার ঘটে,—যৌবন বার্দ্ধক্যের দ্বারা পরাজিত হয। আপনার পিতা, মাতা, আত্মীয স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেরই এক দিন এই দশা ঘটিবে। আপনার রূপবতী সহধর্ম্মিণীর কুসুম সুকুমার অঙ্গলতিকা, আপনার দেবকান্ত মনোহর দেহ সকলই এই অবস্থায পরিণত হইবে।"

শাক্যসিংহ বলিলেন, "হায। মনুষ্যেরা কি এমনই অজ্ঞান, এমনই ক্ষীণচেতা ও নির্ব্বোধ যে যৌবনের মাদকতা প্রযুক্ত বার্দ্ধক্য আসিতেছে এ কথা ভুলিযা যায। শকটবান। শকট ফিরাইযা গৃহাভিমুখে চল। আমার আমোদ প্রমোদে প্রযোজন নাই। আমিও দুই দিন

পরে এই দশা প্রাপ্ত হইব, আমি বৃথা আমোদে দুইদিনকাল নষ্ট করি কেন?” শকট ফিরাইয়া গৃহগমন করিলেন। বৃদ্ধের প্রতি দয়াপ্রকাশে বিস্মৃত হইলেন না।

এক দিন বুদ্ধদেব নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রমোদবনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, জ্বরাক্রান্ত রুগ্ন ক্ষীণদেহ ধূলিধূসরিত এক ব্যক্তি পড়িয়া আছে। তাহার আত্মীয় বান্ধব কেহ নাই, আবাসগৃহ নাই, নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপযুক্ত বল শরীরে নাই, সে আপনার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আপনিই ভীত হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণতর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। শকটবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বিবরণ জ্ঞাত হইলেন, তখন রাজকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন “হায়! পৃথিবীতে মনুষ্যের স্বাস্থ্য স্বপ্নাবস্থায় ক্রীড়ার ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। যাতনায় এবং অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ভাবনায় এইরূপ ভয়ই উপস্থিত হয়। এমন অজ্ঞান কে আছে যে, সে আপনার স্বরূপ ও পরিণাম জানিয়াও আমোদ প্রমোদের বিষয় চিন্তা করিবে?” রাজকুমার রুগ্নের চিকিৎসার্থ বিহিত বিধান করিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এক দিন পশ্চিম তোরণপথে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন প্রমোদোদ্যানাভিমুখে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, পথিপার্শ্বে একটী বস্ত্রাবৃত মৃত দেহ রহিয়াছে। মৃতব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ সেই দেহ বেষ্টন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতরোক্তি, বক্ষে করাঘাত, ধূলি লুণ্ঠিত দেহ প্রভৃতিতে সকলের হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সে শোচনীয় দৃশ্য সন্দর্শনে রাজকুমার শকট চালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হায়! যে যৌবন বার্দ্ধক্যে নষ্ট করিবে, সে যৌবনে ধিক্, যে স্বাস্থ্য শতরোগে নাশ করে, সেস্বাস্থ্যে ধিক্, যে জীবন এমন ক্ষণভঙ্গুর সে জীবনকেও ধিক্! আহা! যদি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু না থাকিত, যদি কেহ চির-

দিনের জন্য এই সকলকে বন্দীস্বরূপ রাখিতে পারিত ; তবে হয়ত পৃথিবী প্রকৃত সুখের স্থান হইত।" তিনি শকটবানকে শকট প্রত্যাবর্ত্তনে আদেশ দিয়া বলিলেন "এক্ষণে মুক্তিমার্গ দেখিতে হয়।" ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মনের এই গূঢ় ভাব আর বাক্যে প্রকাশ হয় নাই।

অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন এইরূপ অনিশ্চয় চিন্তায় সময় যাপন করিতেছিলেন। পরিশেষে এক দিন উত্তর তোরণ পথে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময় একটী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সেই দিন তাঁহার জীবনের কার্য্য নির্ব্বাচিত হইল। সন্ন্যাসীর প্রশান্তমূর্ত্তি, অবনত মস্তক, এবং নিমীলিত নেত্র দেখিয়া রাজকুমার তাহাকে সংযতেন্দ্রিয় যোগী বলিয়া মনে করিলেন। শকট চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ কে?' সে বলিল "মহাশয়। এ এক ভিক্ষুক। সমস্ত আমোদ প্রমোদ ও বৈষয়িক সুখ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ এইরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বনে জীবন যাপন করে। আপনার ইন্দ্রিয় সংযমই ইহার একমাত্র চেষ্টা। এ ব্যক্তি যোগী হইয়াছে। ইহার ক্রোধলোভাদি রিপু নাই, অন্যের উন্নতি দেখিলে মাৎসর্য্যপরও হয় না, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া শান্তিসুখে বিচরণ করে।" বুদ্ধ বলিলেন "ভাল বলিয়াছ। সুধীগণ যোগী-জীবন পরম পবিত্র ও সুখকর বলিয়া সর্ব্বদাই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যে পথে উত্তেজনা হইতে মুক্ত থাকা যায়, বিশ্বব্যাপিনী আশা যাহার নিকট আসিতে পারে না, রোগ শোক প্রভৃতির মর্ম্মদাহ, স্বার্থের অবিরাম চিন্তা যে পথ স্পর্শ করিতে পারে না, আমার সেই পথই অবলম্বনীয়। আমার পর অনেকে এ জীবন অবলম্বন করিবে। এই পথে আমরা প্রকৃত সুখ ও অমরতা লাভ করিব।"

বুদ্ধ রাজপ্রসাদে প্রতিগত হইয়া আপন পিতা ও পত্নীর নিকট সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ বাসনা প্রকাশ করিলেন। কোমল-হৃদয়া গোপাদেবী সজলনয়নে করুণ বচনে শত অনুনয় করিলেন, স্বামীকে

গৃহে রাখিতে যত্নের ত্রুটি হইল না। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা বিফল হইল। তখন তিনি কান্তানুগামিনী বনবিহারিণী সীতা দেবীর ন্যায় স্বামীসহ গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সে আশাও ব্যর্থ হইল। রাজা পুত্রকে নানা রূপ উপদেশ দিলেন, কতমত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল দর্শিণ না দেখিয়া রাজকুমার গৃহ হইতে বহির্গত না হন, পলায়ন করিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। একদিন নিশীথ সময়ে পিতৃনিয়োজিত প্রহরীগণ নিদ্রিত হইলে বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, একজন ভৃত্যমাত্র অনুগমন করিল। অবশিষ্ট রাত্রি অশ্বচালনা করিয়া প্রত্যুষ সময়ে ভৃত্যের নিকট অশ্ব ও আভরণাদি প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে কপিলবাস্তু রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দীনবেশে বৈশালী নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের তিন শত শিষ্য ছিল। যখন ব্রাহ্মণ যতদূর শিক্ষাদানে সমর্থ তাহা আয়ত্ত হইল, শাক্যসিংহ তখন ভগ্ন হৃদয়ে স্থানান্তর গমন করিলেন, মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হইলেন না। ইতঃপর তিনি রাজগৃহের আর একটী ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া দর্শন এবং যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ ঐ সময়ে মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। শাস্ত্রে যে বিষয় অনুসরণ করিতেছিলেন তাহা প্রাপ্ত হইলেন না, তাঁহার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। ব্রাহ্মণের সাত শত ছাত্রের মধ্যে, বুদ্ধের সারল্য, সত্যপ্রিয়তা, বুদ্ধি এবং নিঃস্বার্থ ব্যবহার দৃষ্টে অনেকেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল। পরিশেষে উৎকৃষ্ট শিক্ষা, বিপুল শাস্ত্র জ্ঞান এবং পাঁচ জন সহাধ্যায়ী সঙ্গী লইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণার্থ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। উরুবিল্ব নামক পল্লীর সমীপবর্ত্তী নিভৃত অরণ্যে গমনপূর্ব্বক তপস্বীর ন্যায় যোগ সাধনে নিবিষ্ট হইলেন। এই ভাবে ছয় বৎসর কাল অতিবাহন করার পর তাঁহার বোধ হইল সন্ন্যাস ধর্ম্ম

মনের শান্তি বা মুক্তিমার্গ প্রদান করা দূরে থাকুক বরং তৎপরিবর্ত্তে অন্তঃকরণ নানারূপ চিন্তায় কলুষিত এবং সত্যের পথ হইতে অপসারিত রাখে। তখন তাঁহার বাণপ্রস্থ ধর্ম্মে বিরাগ জন্মিল, কঠোরতা একবারে পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গীয় পাঁচ জন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার হৃদ্বোধ হইল, লোকে জীবনকে কষ্ট দিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। স্থির হৃদয়ে গম্ভীর চিন্তার পর তাঁহার মনের ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত চিরপ্রসিদ্ধ চতুর্থাশ্রমের বিরুদ্ধে এই নূতন সত্য নির্ণয় করিলেন। বোধি তরুমূলে গম্ভীর চিন্তার পর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, বলিয়া তদবধি তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন গত হইল। এই সত্য অন্যের নিকট প্রকাশ করিবেন কি না সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রকাশ করাই স্থির হইল। প্রকাশের ফল অতি চমৎকার, অতি মহৎ। লক্ষ লক্ষ লোকের অদৃষ্ট বুদ্ধদেবের মনের সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে ছিল, তাঁহার সংকল্পের সহিত সে সমস্ত মীমাংসা হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ শত সহস্র যুগ পরিশ্রম পূর্ব্বক যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কোটি কোটি লোকের হৃদয় হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্তর্হিত ও অনন্ত বায়ুরাশিতে লীন হইল।

ললিতবিস্তরের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবের সংকল্প স্থির হওয়ার পর তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও সর্ব্ববিদ্যার কেন্দ্রভূমি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে পাঁচ জনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহারাই প্রথম শিষ্য হইল। এবং আরও তিন শত ব্যক্তি তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। অনন্তর মগধেশ বিম্বীশর বুদ্ধকে আপন রাজধানী রাজগৃহে আহ্বান করিলেন। সেখানে কালান্তক নামক মন্দিরে এবং গৃধ্র শৃঙ্গ নামক পঞ্চ পর্ব্বত শিখরে দণ্ডায়মান

হইয়া শাক্যসিংহ অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সারিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদগল্যায়ন তাঁহার প্রধান শিষ্যত্রয় এই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। দুর্ভাগা রাজা তাঁহার কৃতঘ্ন পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক হত হইলে বুদ্ধদেব গঙ্গানদীর উত্তরবর্ত্তী শ্রাবস্তী নামক স্থানে অবস্থান করেন। তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক এক ধনাঢ্য বণিক তাঁহাকে এবং তাহার সঙ্গীয় শিষ্যবর্গকে অবস্থান জন্য এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রদান করেন। শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ বক্তৃতা এই স্থানে প্রদত্ত হয়। সেই প্রদেশের রাজা প্রসন্নজিৎ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে বুদ্ধদেব আপন পিতার নিকট কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে, তিনি মনুষ্যের অসাধ্য অনেক কার্য্য সাধন পূর্ব্বক শাক্যবংশীয় সকলকে আপন মতাবলম্বী করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিনী হন। তাহার মাতৃস্বসা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধ মতে দীক্ষা পান। নানকপত্নীর ন্যায় গোপাদেবী ক্রোধ পরবশ হইয়া আপনার দেবদুর্ল্লভ স্বামীকে পরিত্যাগ ও অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন না, প্রকৃত সাধ্বী পতির প্রতিগমন প্রতীক্ষায় দ্বাদশ বৎসর বসিয়াছিলেন, যুগান্তে স্বামী দর্শন করিয়া নিরতিশয় সুখী হইলেন।

বুদ্ধদেব আর এক বার রাজগৃহে গমন করেন। তখন তাঁহার পরম শত্রু, আপন পিতার প্রাণহন্তা অজাতশত্রু আপন পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সমস্ত দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন, এবং শত সহস্র অনুচর সহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় যখন গঙ্গা পার হইতেছিলেন তখন এক প্রস্তর খণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া রাজগৃহের দিকে মুখ ফিরাইয়া আর্দ্র চিত্তে বলিয়াছিলেন, "রাজগৃহ এই শেষ দেখিলাম।"

তিনি বৈশালীও দর্শন করেন। নগরবাসীগণের নিকট বিদায় হইয়া কুশী নগরের সমীপস্থ হইলে বুদ্ধদেবের শরীর অবসন্ন হইয়া

আসিল। একটী শালবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। সপ্ততিবর্ষ বয়সে সিদ্ধার্থের মূল্যবান্ জীবন দেহ হইতে অন্তর্হিত হইল।

যে সকল মহাপুরুষ আপনাদিগের অসাধারণ ক্ষমতাবলে কোন নূতন মত প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে তুলনা করিলে শক্তির ন্যূনাতিরেক হইলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই যে অতি প্রধান লোক তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যীশু-খ্রীষ্ট, মুসলমানধর্ম্ম প্রণেতা মহম্মদ, শিকগুরু নানক, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা চৈতন্যদেব, শৈব মত প্রচারক শঙ্করাচার্য্য,—যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাঁহারই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহাঁদের প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্মিতা, অবিচলিত ধৈর্য্য, প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য, সত্যানুরাগ প্রভৃতিতে আপনাদের সমশ্রেণীস্থ মনুষ্যদিগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব এসকল ব্যক্তির মধ্যে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন ছিলেন না।

কেবল উল্লিখিত মানসিক শক্তি প্রভৃতিই যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব হইত, যদি তিনি ধর্ম্মের জন্য রাজ্য ধন পরিজন সমস্ত পরিত্যাগ না করিতেন, তবে লোক-হৃদয়ে যে বহু বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অলৌকিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ পারিতেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার অতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সকল প্রকার সৎকার্য্যেরই আদর করিতেন, "অহিংসা সনাতন ধর্ম্ম" বলিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেন, এবং আপন পবিত্র দৃষ্টান্তে সংসারে সকলকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় আরও তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, প্রত্যেক বিষয় মনে মনে দীর্ঘকাল অনুশীলন করিতেন, মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে তন্ন তন্ন করিয়া তাহা মীমাংসা করিতেন, মীমাংসার পর মনে যে ধারণা জন্মিত, সেই ধারণার উপর বিশ্বাস স্থাপিত হইত। সে বিশ্বাস এত দৃঢ়, এত অবিচলিত যে, হিমাচল সচল হইলেও তাহার সে বিশ্বাস বিচলিত হইত না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভাব সময়ে বুদ্ধদেব আপন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে কিরূপে কৃতকার্য্য হইলেন বুঝিতে হইলে তাঁহার মতের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, "মনুষ্যগণ মধ্যে সকলে সমান, লঘু গুরু নাই"; দ্বিতীয়তঃ "হিংসার অভাবই ধর্ম্ম, ভাবই অধর্ম্ম, ধর্ম্মের ফল নির্ব্বাণ-মুক্তি" শাক্যসিংহের এই কথা কয়টী সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

সংসার বৈষম্যপূর্ণ। রাজা প্রজা, বিদ্বান মূর্খ, ধনী নির্ধন, কুলিন অকুলিন, সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি সমাজ ও অবস্থাগত বৈষম্যে সংসার চিত্রবিচিত্র। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সামাজিক বন্ধনে সেই বৈষম্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ে এবং ক্রমাগত বর্ণশঙ্করে অসমানত্ব এতদূর স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত যে, তাহাতে কোন রূপ পরিবর্ত্তন না হইলে সংসার চলিতে পারেনা। কি উপাসনা প্রণালী, কি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্যকলাপ, কি ঋণ গ্রহণ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাইত, পক্ষপাত যেন সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত মতের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতা ও শ্রেষ্ঠতা লাভের বাসনা প্রত্যেক হৃদয়ে বলবতী, তাহার নাশ হইলে সকলেই অসন্তুষ্ট, মনের পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রহিল না দেখিয়া সকলেই বৈরক্তি প্রকাশ করিত। আবার ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা সেই সময়েই লাভ হয়। ন্যায়ের কূট প্রশ্নের মীমাংসায় লোকের মন ধাবিত ছিল। এক দেশ-দর্শী পাঠকগণের সাঙ্খ্যদর্শনাদির অকাট্য প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেকের সন্দেহ হইতে লাগিল। কপিল যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা আর মীমাংসা হইবে না বলিয়া অনেকের ধারণা হইল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে গৃধ্রশৃঙ্গ পর্ব্বতের পঞ্চ শীর্ষোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহাবাগ্মী মহাপণ্ডিত বুদ্ধদেব তারস্বরে বক্তৃতা করিলেন, "সকলে সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ নাই, ঈশ্বর

ভেদ জ্ঞান করেন না, সেই পরাৎপর পরমপুরুষ প্রকৃতির বিশাল বক্ষে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, অনিলের স্বন্ স্বন্ শব্দে, তটিনীর কল কল রবে অশনির শ্রুতিকঠোর ধ্বনিতে এই ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার সৃষ্ট সকলে সমান, লঘু গুরু নাই, ইতর বিশেষ নাই। যে অনন্ত প্রস্রবণ হইতে এই অখিল বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেই সকল বিলীন হইবে, মহানির্ব্বাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত রহিবে। আত্মার অবমাননা করিও না, আত্মার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলে না, আত্মা স্বাধীন, আত্মা ঈশ্বর, সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান, সকলে এক, সকলে সমান।"

"সকলে সমান" মন্ত্রের ন্যায় এই মহাবাক্য কোটি জীমূতমন্দ্রবৎ ধ্বনিত হইল। সেই মহাশব্দ হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ধাবমান হইল। মহার্ণবে প্রতিধ্বনিত হইয়া সিংহল, সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি দ্বীপ বাসীগণকে জাগরিত করিল, পর্ব্বত পরম্পরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া তিব্বত, চীন, তাতার প্রভৃতি বহু বিস্তৃত রাজ্য সকলে তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। সেই বিশাল শব্দে আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্মের খরস্রোতে সমস্ত ভারতভূমি ভাসিয়া গেল। সকলে কহিতে লাগিল, "আর প্রধান মানিব না, আর আত্মাকে অন্যের নিকট উৎসর্গ করিব না।"

'অহিংসা সনাতনধর্ম্ম' জ্ঞানে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড ধারণ করিতে লাগিল, সংসারে বিরাগ হইয়া নির্ব্বাণ (নাশ নহে, তত্ত্বজ্ঞান) কামনায় অনেকে চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিল, সমাজে এবং ধর্ম্মে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিয়া উঠিল। ধর্ম্মোন্মত্তগণের নিকট বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, বৌদ্ধের মত রহিল না, তাঁহার তিরোভাবের পর অল্প দিনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল, অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করাও কর্ত্তব্য বোধ করিল না। পরিশেষে আর্য্যধর্ম্ম রক্ষার্থ অগ্নিকুলোদ্ভব বীরগণ কিরূপে নাস্তিক বিনাশ করেন, প্রমুরা

বংশীয় রাজগণ বিরূপে নেপাল, ভূটান ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ তত্তাবৎ অবগত আছেন।

শাক্যসিংহ যে স্থানে রাজাভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনবেশে ভৃত্যের নিকট বিদায় হন, ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, উত্তর কালে সেই স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হ্যাইওয়েন সাঙ্ কুশীনগরে গমন সময়ে অরণ্যের নিকট একটী স্তম্ভ দেখিতে পান, বিহারাধীশ অশোক ঐ স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করান। ঐ স্থান গোরখপুর হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত আছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, ভারতবর্ষে কত উপপ্লব, কত রাজার পরিবর্ত্তন, কত ধর্ম্মদ্রোহ ঘটিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি সার্দ্ধ পঞ্চ চত্বারিংশ কোটি লোকে অতি আদরের সহিত তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে।

ধর্ম্ম প্রচারকগণ মধ্যে কেহই সিদ্ধার্থের ন্যায় অল্প সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় প্রলোভন বা শোণিত স্রোত অথবা হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় কঠোরতা নাই, যীশুখ্রীষ্টের বহু বিস্তৃত ধর্ম্মের ন্যায় তাহাতে শত শত মতভেদও নাই, বৌদ্ধের মত শারদীয় চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কৌমুদীর ন্যায় অতি পবিত্র ও নির্ম্মল। শিষ্যগণের চেষ্টায় সেই নির্ম্মলতায় কালিমা স্পর্শ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি শাক্যসিংহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কোটি কোটি লোকের আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজত্ব করিবে সন্দেহ নাই।

নওশেরার-সংগ্রাম।

প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে নিতান্ত সামান্যাবস্থা হইতেও কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের ঘটনাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনবৃত্ত তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি কিরূপে সমগ্র পঞ্জাব দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কেমন অলৌকিক পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বজনলষণীয় সংসারের নন্দন কানন কাশ্মীর রাজ্য হস্তগত করিয়া আফগানিস্থানের দুরাণী বংশীয় রাজগণকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেন, ইতিহাস প্রিয়পাঠক মাত্রেই তত্তাবৎ অবগত আছেন। এস্থলে তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—নওশেরার যুদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপে প্রকটন করিব।

যেরূপ আভ্যন্তরিক গোলযোগ, ও দুর্ব্বলতাসূত্র অবলম্বন করিয়া মহম্মদঘোরী ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করেন, দূরদর্শী মহারাজ রণজিৎ সিংহ আফগানিস্থানের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সেইরূপ সুযোগ দেখিতে পান। সরদার ফতে খাঁ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদে নিরত থাকাতে দেশের শাসন প্রণালী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং সৈনিকবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রণজিৎ সিংহ সেই সুযোগে পেশোযার প্রদেশ হস্তগত করার বাসনা করেন। এই আকাঙ্ক্ষা বহু দিন পূর্ব্বেই তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তাহা পূর্ণ করণার্থ আটকের দুর্গটী অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিপক্ষ রাজ্যে প্রবেশ-দ্বার নিষ্কণ্টক থাকাতে মহারাজের সেনাগণ অনাযাসে অগ্রসর হইল। সূর্য্য, চন্দ্র, প্রমুরাবংশীয় বীরগণের পর এই প্রথমবার ভারতবর্ষীয় রাজা যবন রাজ্য আক্রমণে চলিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রাতঃস্মরণীয় ১৩ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় বীরগণ সিন্ধু নদ অতিক্রম পূর্ব্বক আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

আফগানিস্থানের তদানীন্তন প্রধান সরদার আজম খাঁ তপনপ্রতাপ পঞ্জাব ভূপতির পরাক্রম বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। একাকী তাঁহার সম্মুখীন হওয়া নিতান্ত কঠিন দেখিয়া স্বদেশীয় সরদার ও ধার্ম্মিক মুসলমানগণের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি "কাফেরগণের" বিরুদ্ধে সনাতন মুসলমানধর্ম্ম-রক্ষার্থ-যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। একেত মুসলমান জাতি 'কাফেরের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাহাদের শাস্ত্র সম্মত পরমার্থ, তাহাতে আবার আজেম খাঁর অনলোদ্গারী বাক্য,—আফগান রাজ্য ক্ষেপিয়া উঠিল। পর্ব্বত প্রান্তরাদি সকল স্থান হইতে ভীমপ্রকৃতি যবনসৈন্যগণ আসিতে লাগিল। আটকের তরু-গুল্ম-বিবর্জ্জিত শৈলরাজী, সোগাদ এবং বোনেইর প্রদেশের শ্যামল শস্য শোভিত ক্ষেত্র সকল মুসলমান সৈন্যে আবৃত হইল। আমীর ওমরাও, কাজী মোল্লা, স্ত্রীলোক পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, বহু সংখ্যক আফগান কাবুল নদীর বাম পার্শ্বস্থ নওশেরা নগরীতে শিবির সন্নিবেশ করিল। উজীর, রাজ্যের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সহ নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী উচ্চ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহার এক দল সৈন্য উজীরের গতি রোধ করিতে প্রয়াস পাইল, স্বয়ং অবশিষ্ট চতুর্ব্বিংশ সহস্র বিক্রান্ত সৈন্যের সহিত শার্দ্দূলবৎ নৃশংস পার্ব্বত্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। সংগ্রামপ্রিয় আখালী জাতীয় ফুলাসিংহ সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক উন্মত্ত পবনবৎ প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিল। ইয়ুসফজীগণ দুর্ভেদ্য দুর্গবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া অপ্রতিহত প্রতাপে আক্রমণের প্রতিরোধ জন্মাইতে লাগিল, এবং তাহাদের মধ্যে বোনেইর প্রদেশীয় এক নির্ভীক যুবক কৌশল পূর্ব্বক ফুলাসিংহের হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তরবারির এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। সেনাপতি নিহত হওয়াতে শিকসৈন্যগণ আর পূর্ব্ববৎ যুঝিতে পারিল না, ইয়ুসফজীগণ জয়ো-

ল্লাসে ভীষণ শব্দ করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হওয়াতে তাহারা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। পলায়ন ব্যতীত আত্মরক্ষার উপায় রহিল না। বোনেইর এদেশীয় ইয়ুসফজীগণ আগ্নেয়গিরি-নিসৃত অগ্নিময় স্রোতের ন্যায় ভীমবেগে ভীষণ শব্দ করিয়া অনুগামী হইল। ভল্ল তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের আন্দোলনে, প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় উন্মত্ত যবন সৈন্যের অপ্রতিহত আক্রমণে এবং ভবাবহ রণশব্দে নির্ভীক শিক-সৈন্যের অন্তঃকরণে মুহূর্ত্ত জন্য ভীতির উদ্রেক করিল। মহারাজ দূর হইতে সে অবস্থা দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার কামান সকল বজ্রনাদে রঙ্গভূমি কম্পিত করিয়া অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল যবনসৈন্যের সহস্র সহস্র ভূশায়ী হইল, শিকসৈন্যগণ সেই অবসরে শ্রেণীবদ্ধ হইতে ভুলিল না। শিকগণের গোলা বর্ষণে আফগানদিগের সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অবিচলিত অধ্যবসায় অথবা অটল সহিষ্ণুতার হ্রাস হইল না। আফগানগণ যখন দেখিল তাহাদের গুলি বারুদ নিঃশেষ হইয়াছে, তখন তীর তরবারি, ভল্লাদি লইয়া যুঝিতে লাগিল। পরিশেষে পার্ব্বতীয়গণ শিলাখণ্ড সকল বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া লঙ্কাসমরের পুনরভিনয় করিল। এক-বার, দুই বার ক্রমে তিন বার আফগানেরা পরাস্ত ও তাড়িত হইল, কিন্তু প্রত্যেক পরাজয়ের পর জয়ী সৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহে শোণিতস্বাদপ্রাপ্ত ভীষণতর শার্দ্দূলের ন্যায় ধাবমান হইয়া "আল্লাহো আকবর" মুসলমানের এই চির প্রসিদ্ধ যুদ্ধনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে প্রৌঢ়া রমণী ও মোল্লাগণ উচ্চৈঃ-শব্দে বিপক্ষকে অভিসম্পাত এবং স্বপক্ষকে আশীর্ব্বাদ করিতে কোলা-হল করিয়া উঠিল।

বিক্রমকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহ স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্র-বর্ত্তী হইয়া বিপক্ষ পার্ব্বত্যগণের প্রতি বার বার আক্রমণ করিতে লাগি-লেন। যে পরাক্রমে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী রাজা ও সরদারগণ

একে একে পরাস্ত হইয়াছিলেন, অতি কৌশলের সহিত ততোধিক পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিল না। সমস্ত দিন গত হইল; রজনীর অন্ধকার সমরাঙ্গণ আবরণ করিল, কিন্তু তথাপি যুদ্ধ শেষ হইল না। আফগানগণের দুর্ভাগ্যক্রমে সরদার মহম্মদ আজেম খাঁ নদীর অপর পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে রাজকোষের মূল্যবান্ সমগ্র সম্পত্তি, সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল, এবং তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ থাকাতে সহজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। নদীতে জল অল্প ছিল, অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট ছিল না, তথাপি অল্প সংখ্যক সৈন্য তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল। যদি তিনি অগ্রসর হইতে পারিতেন, যখন বিজয়লক্ষ্মী একবার শিক শিবিরে একবার আফগান স্কন্ধাবারে, অনিশ্চয়ভাবে যাইতেছিলেন, যদি তখন সেই মূল্যবান সন্ধিসময়ে আপন সৈন্যগণ সহ পার্ব্বতীয়গণের সহিত মিলিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে রণজিৎ সিংহের অদৃষ্টে জয়লাভ ঘটিত কি না সন্দেহ। হয়ত ইতিহাস একবারে পরিবর্ত্তিত হইত; পঞ্জাবে ব্রিটিশ-সংগ্রামের চিহ্ন মাত্র থাকিত না, চিলিয়ানওযালা অথবা ফিরোজসাহীর সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামও ঘটিত না। সরদার মহম্মদ আজেম শত্রুহস্তে সমগ্র সম্পত্তি ও তদপেক্ষা মূল্যবান্ রমণীগণ পতিত হইবে ভয়ে ভীত ছিলেন, তিনি জেলালাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; সঙ্গীয় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইযা পলায়ন করিল। আজেম খাঁ কয়েক দিন মধ্যে লজ্জা ও অনুতাপের বিনিদ্রকরণ হৃদিশৈল্যে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

নওশেরার রঙ্গভূমি নৈশ অন্ধকারে আবৃত হইল, ভীষণ পার্ব্বতীয় ইয়ুসফজীগণ তখনও সে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল না। তাহারা একটী উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইযা প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের শ্রেণী সকল ক্ষীণ হইযা চলিল, একটী মাত্র শ্রেণী ব্যতীত আর অবশিষ্ট রহিল না, যে যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থানেই চি দিনের

জন্য শয়ন করিল। শিকগণ তাহাদিগকে চারি দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মের পবিত্র নামে মুসলমান-হৃদয়ে যে অধ্যবসায়ের ভীমানল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা শোণিতে নির্ব্বাপিত হইল। আফগানগণ যার পর নাই সাহসী ও বলবান সত্য, কিন্তু তাহারা শিকদিগের ন্যায় রণকুশল অথবা স্থিরপ্রতিজ্ঞ নহে। আফগানেরা যখন উন্মত্ত ঝটিকার ন্যায় অব্যর্থ বেগে শত্রুর প্রতি ধাবমান হইয়া আক্রমণ করে, তখন সত্য সত্যই তাহারা অতুল্য; তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু যখন সেই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যখন শত্রুর অবিচলিত অধ্যবসায়ে তাহাদিগের অবস্থা দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তখন আর তাহারা আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। পরাজয়োন্মুখ আফগান প্রায় বঙ্গবাসীগণের ন্যায় দুর্ব্বল। ইয়ুসফজীগণ বুঝিতে পারিল আর রক্ষা নাই, আর জয় লাভের আশা নাই। তখন তাহারা অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া বিপক্ষদিগের মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। মহারাজের তুরঙ্গম সকল আর তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াও ধরিতে পারিল না। রণজিৎ সিংহের জয়লাভ লইল। ভারতবর্ষের জয় পতাকা অনেক কাল পরে আফগান ভূমির মধ্যস্থলে নওশেরার রক্তাঙ্গনে উড্ডীয়মান হইয়া নৈশ সমীরণে দুলিতে লাগিল।

উভয় পক্ষে মৃতের সংখ্যা জীবিতাপেক্ষা অধিক ছিল। মহারাজ জয়লাভ করিয়াও নওশেরার রঙ্গভূমিতে নিহত বিশ্বস্ত সৈন্যগণের জন্য অনেক কাল আক্ষেপ করিতেন। এরূপ ভীষণ সংগ্রাম অতি অল্প ঘটে। প্রভাতে দেখা গেল ইয়ুসফজী ও শিকগণ এক শয্যায় চিরদিনের জন্য শয়ান; একের দশনপংক্তি অন্যের গলদেশে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া কিরূপ ভীষণাবস্থায় উভয়ের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে তাহা দেখাইতেছে। বলিষ্ঠ আফগান দীর্ঘকায় শিকের এক পা আপন পদতলে রাখিয়া দুই হস্তে অন্য পা ধরিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত জরাসন্ধের ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অমনি শিকের কামানের গোলায়

সে নিহত হইয়া মৃতকম্প শিকের উপর পতিত হইযাছে, পরে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিযাছে।

নওশেরার যুদ্ধ-বিজয শিকদিগের ইতিহাসের অতি গৌরবের ঘটনা। একচক্ষু বৃদ্ধ রাজা যখন সেই বিষয আলাপ করিতেন, তাঁহার চক্ষুটী উজ্জ্বল হইত, মুখশ্রী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিত। তিনি অতি আহ্লাদের সহিত সেই বিজয দিনের বিজয় লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য বর্ণন করিতেন। বীর ভিন্ন অন্যে বীরের মর্য্যাদা জানে না, রণজিৎ সিংহ বীর বিপক্ষগণের যশোবর্ণন ভাল বাসিতেন। "ইয়ুসফজীগণ মৃত্যুকে দেখিযা হাস্য করে" এই কথাটী শিকগণ সর্ব্বদাই বলিত এবং মনের সহিত তাহাদিগকে প্রশংসা করিত।

নওশেরার পরাজযে ইয়ুসফজীগণ অতিশয ক্ষতিগ্রস্ত হয ; এখন পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্ব বল প্রাপ্ত হয নাই। এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধগণ সেই কাল সমরের বৃত্তান্ত বর্ণন করে। কোন একটী ইংরেজ ভ্রমণকারী এই ঘটনার সপ্তদশ বৎসর পরে বোনেঁইর প্রদেশে গিয়াছিলেন। তিনি তখনও দেখিতে পান, দেশস্থ সকলে নওশেরার শোচনীয় পরিণামের বিষয আলাপ করিত ; সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক করুণরসপূর্ণ গান গাইত। "আহা! মহাম্মদ আজেম! নওশেরার রণক্ষেত্রে তুমি তোমার যে সকল সন্তান বিক্রয করিযাছ, তাহাদের শোণিত এখন কোথায?" এইরূপ শোক প্রকাশক গানে তাহাদের মনোবেদনা প্রকাশ পাইত। কোন উৎসব উপলক্ষে যুবকগণ যখন অধিক উল্লাসে আমোদ প্রমোদ করিত, তখন বৃদ্ধগণ এই বলিযা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিত, "তোমাদের ভ্রাতৃগণের অস্থি এখনও নওশেরায পতিত আছে, এবং সমস্ত ক্ষেত্র ধবলিত করিতেছে, এই কি তোমাদের আহ্লাদের সময?"

শিকদিগের ইতিহাস এক্ষণে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তথাপি নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে আফগান বীরস্তো-

পবনের সকল গুলি উৎকৃষ্ট পুষ্প বৃন্তহীন হওযার পর কাবুলে ব্রিটিশগণের যে অবস্থা ঘটিযাছিল, এবং সে দিনও যে দশা হইল, তাহার সহিত তুলনা করিয়া ইতিহাসপ্রিয পাঠকমাত্রই শিকগের রণবিজয সমাদরে স্মরণ রাখিবেন, সংশয নাই।

ভারতে আশা।

"আশা কি?" এই প্রশ্ন লইযা কবির সমক্ষে উপস্থিত হও। কবি অস্থিরমতি। তিনি একবার বলিবেন, "আশা এক পরম সুন্দরী সিমন্তিনী, হৃদযানন্দ বিধাযিনী।" আবার পরক্ষণে বলিবেন, "আশা-মরীচিকা, মাযাবিনী।" ইহার মধ্যে কোন্‌টী সত্য?

উপদেষ্টৃগণকে জিজ্ঞাসা কর, "আশা কি অবলম্বনীয?" তাঁহারা বলিবেন, "শুধু আশাই মানব-জীবনের অবলম্বন, দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে আশা মনুষ্যের সুখের তরণী।" দ্বিতীয বিবেচনার পর বলিবেন, "আশার বশবর্ত্তী হইও না। এই রঞ্জিত দর্পণের মধ্য দিযা যত কিছু সুন্দর দেখা যায, জ্ঞান নযনে সন্দর্শন করিলে সকলই কুরূপ কদাকার। আশা করিযা নিরাশ হওযা অপেক্ষা আশা না করাই ভাল।" এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয?

তুমি বালক, সংসারে প্রবেশ করিতেছ, দেখিতেছ সকলই সুন্দর, সকলই নূতন। দেখিতে দেখিতে তোমার জীবনের সরস বসন্ত উপস্থিত। আনন্দ-বিস্ফারিত নযনে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণে হৃদযে অভিনব ভাব উদ্দীপ্ত হইল। জীবনতটিনী কৌমুদী-বিধৌত স্রোতঃসহ নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইলে, আশা তোমার হৃদযচক্রে মধুক্রম রচনা করিযা গুন্ গুন্ রবে চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। সুতরাং আশার বিপক্ষ কবিগণ তোমার বিবেচনায বাতুল ও নির্ব্বোধ।

ক্রমে তোমার বয়সের পরিণতি আরম্ভ হইল, দুর্ভাগ্য বশতঃ তেজস্বিতাও কমিয়া গেল। যে সংসারকে এতদিন সুখসরোবর বিবেচনা করিয়া মানস সরোবরে রাজহংসবৎ বিচরণ করিতেছিলে,—উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্ম ধরিবার জন্য যত্ন করিতেছিলে, এক্ষণে সেই সরোবরে তরঙ্গ বাঁধিল। তোমার সুখের স্বর্ণকমল রত্নময় মৃণালসহ গম্ভীর জলধিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

দীর্ঘকাল যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছিলে, এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলে, সে প্রকৃত সুখ নয়, তোমার কম্পনা-প্রসূত ছায়া মাত্র, ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত উষ্ণ-নিশ্বাস মাত্র, দুস্তর সংসার মরুতে মরীচিকা মাত্র।

সংসারে আশার সুখ যদি মৃগতৃষ্ণিকা হইল, রবিকিরণে বালুকারাশিই যদি মনুষ্যচক্ষে ভ্রম জন্মাইল, পিপাসায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইযাছে তাহাকে জলদানের আশা দিয়া যদি জলাশয় ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, তবে আর ক্রিজিয়াধিপতি ক্রান্তেলসের অবস্থা শোচনীয় কেন?

যদি সকলের অবস্থাই ঐরূপ হয়, তবে লোক আশা করে কেন? অপেক্ষাকৃত উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে যত্ন করে কেন?

আশা মনুষ্যের জীবনের জীবন। অপরিণামদর্শিতার জন্য এক জন কষ্ট পাইবে বলিয়া জগৎ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আশা বিহীন হইয়া জীবন ধারণ অসম্ভব, যদি সম্ভবপরও হইত, তথাচ অসুখের সীমা থাকিত না। আশা, সুখ-প্রাসাদের ভিত্তিভূমি। যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর শোক-সন্তাপনিদাঘে কেতকী-গর্ত্তপত্রের ন্যায় দগ্ধ হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসার-সুখ-সম্ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া অহোরাত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহারও মনে আশা আছে। কারণ ও কার্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ, আশা ও জীবনের তদ্রূপ,—কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই, আশা ব্যতিরেকে জীবন ধারণও হইতে পারে না। পুষ্পাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ফলের ন্যায় প্রত্যেক আশাভ্যন্তরে সুখ আছে। যাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহময়ী জননী সন্তানের জন্য দুর্ব্বিসহ কষ্ট

সহ্ করেন, মুমূর্ষু অপত্যের মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বসিয়া থাকেন; যাহার উত্তেজনায় ছাত্রগণ সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া নিদ্রাক্রান্তনয়নে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, কৃষক মধ্যাহ্ন সময়ের অগ্নিকণবর্ষী আতপ-তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও হল চালনা করে, তাহারই নাম আশা।

আশা চিরসঙ্গিনী; আশার তুল্য বিশ্বস্তা আর নাই। বালক নিরাশ্রয়, আশা তাহার প্রতিপালিকা স্নেহময়ী ধাত্রী। যুবক আশার বাক্য বিশ্বাস করে, তাহার মধুরতা বুঝিতে পারে, আশা তাহার রসময়ী সহচরী। বৃদ্ধ কালশয্যায় শয়ান, জীবনের পাপানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, শয্যা কণ্টকময়; আশা কোমল হস্ত-পরামর্শে তাপিত হৃদয় শীতল করিতেছে, কণ্টক দূরীকরণে প্রয়াস পাইতেছে, অন্ধতমসাবৃত ভবিষ্যৎপথ সুগম করিতে প্রদীপ হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

গ্রীককবি কল্পনা প্রসূত প্যাণ্ডোরার উপন্যাস হইতে আশার মহীয়সী শক্তি পরিগ্রহ হইতে পারে। দুঃখ দুর্দ্দশায় জড়িত বিকৃত দেহ ইপিমিথিয়স্ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও আশার অবলম্বনে সুখে ছিলেন।

এক্ষণে ভারতও ইপিমিথিয়সের অবস্থাপন্না,—শোকে দুঃখে জড়িতা, বিকৃতাঙ্গী, বিবর্ণা। বিশেষ এই, ভারতে তাঁহার ন্যায় আশা দেখিতে পাই না। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যে অদৃষ্টবাদী নির্ব্বোধ নাবিক পোতের কর্ণ ছাড়িয়া দিয়া যেমন ভাগ্য পরীক্ষা করে, উপর্য্যুপরি উপপ্লব-মর্দ্দিতা ভারতেরও এখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। ভারতের আর পূর্ব্ব গৌরব নাই, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যে সময়ে বিনির্ম্মল আশা জ্যোতিতে ভারতবাসীগণের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরভাগ-আলোকময় করিয়াছিল, যে সময়ে তাঁহারা উন্নতিশৈলের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, যে সময়ে গ্রীস, রোম, মিসর প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য সকল ভারতের নিকট

জ্ঞানের জন্য ঋণী ছিল ; এক্ষণে আর সে দিন নাই। ষড়দর্শন-প্রয়োজিকা বুদ্ধি এইক্ষণ অনুকরণে রত। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির বাহুবল আত্মদ্রোহে পর্য্যবসিত। যবনবিপ্লবে বীরপ্রসবিনী আর্য্যভূমি ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, পৃথ্বীরাজের সহিত সমস্ত আশার মূল উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত মণ্ডলীর বিজ্ঞান বিতর্ক ফুরাইয়াছে। এখন ভারত বীর্য্যহীনা ভূপতিতা।

ভারতের পতিতাবস্থা হইতে পুনরুত্থান হইবে কি না এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়। পতন হইতে উত্থান প্রকৃত মহত্ত্ব, কিন্তু সে মহত্ত্ব এদেশে আছে একপ আশা হয় না কেন? আমরা দেখিলাম, রোমপদানত গল রাজ্য বিজ্ঞান প্রসূতি ফরাসি রাজ্যে পরিণত হইল। সময় পাইয়া অশ্রুসিক্ত মলিন বসন গ্রীস ও রোম রাজ্যকে আবার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত ও উন্নত করিতে ফ্রান্সই প্রধানতঃ সহায়তা করিল। আবার কাল চক্রের আবর্ত্তনে জর্ম্মণ হস্তে ফরাশি জাতি পরাস্ত হইল, দেখিতে দেখিতে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক ফ্রান্স আপন পূর্ব্ব গৌরব ও পদবী লাভ করিল। এই দৈব বলই আশার প্রতি অচলা ভক্তি। এক নেপোলিয়ন সিংহাসন চ্যুত হইলেন বলিয়া ফরাসি দেশ হতশ্রী হয় নাই। কোটি নক্ষত্র সমুজ্জ্বল নভোমণ্ডল একটী গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া এক দিকে গড়াইয়া পড়িলেও নিস্তেজ বা মলিন দেখায় না। সহস্র সহস্র প্রাণি-নাশেও আশা খর্ব্ব হয় নাই। যে দেশ উন্নতির চরম সীমা দেখিতে ব্যস্ত, সে দেশ উন্নতির সোপান পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইলে ভীত হইবে কেন? অভাবই প্রভাব, এ কথা প্রতিপন্ন হইল। আমাদের ভারতেশ্বরীর রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত হয় না, সূর্য্যের গতির সহিত পৃথিবী বেষ্টন কর সকল স্থলে তাঁহার অধিকার দেখিতে পাইবে। তথাপি আশার শেষ নাই। কেন্দ্রে কেন্দ্রে আবিষ্কার হইয়া ব্রিটিশ পতাকা গৌরবের সহিত দুলিতেছে, নন্দন কানন তুল্য দ্বীপে দ্বীপে ব্রিটিশসিংহ গর্জ্জন করিতেছে। আশা ও চেষ্টার সাহায্যে কেসি-

ভেলেনসের পর্ণকুটীরাবৃত ব্রিটন এক্ষণে মার্ত্তণ্ড তুল্য প্রভাবশালী সৌধরাজি বিরাজিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ।।

ভারতে আশা নাই উন্নতিও নাই। স্পেনদেশীয়গণের নৃশংস ব্যবহার হইতে দক্ষিণ আমেরিকাবাসীগণ আশার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু পতিত ভারত আর উঠিতে পারিল না।

অনেকে বলেন, আশা শক্তি-সাপেক্ষ। ভারতে শক্তি নাই, আশা কোথা হইতে আসিবে? এ নিতান্ত অদূরদর্শীর কথা। আশা শক্তি সাপেক্ষ নহে, বরং শক্তিই আশার অনুগামিনী। শক্তি স্থিতিস্থাপক, আশার আকর্ষণ ব্যতীত বড় হয় না। আশাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহা হইলে শক্তিই সীমাবদ্ধ হয়। মহাবল নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যখন কর্সিকাস্থ এজেসিয়োর সৈনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার শক্তি কত ছিল? যদি তাঁহার গগনবিহারিণী আশা সেই সময়ে অনতি-পরিস্ফুট কুসুম-কোমক সদৃশ বালশক্তিতে সীমাবদ্ধ করিতে পারিতেন, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশের আরম্ভ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে যে অত্যাশ্চার্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। আশা-প্রণোদিত না হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের রাজ্যাংশ হইতে সামান্যাবস্থ পার্ব্বতীয় কখনও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিত না,—শিবজীকে মহারাষ্ট্র কুলতিলক বলিয়া কেহ স্মরণ করিত না।

আশার প্রভাব কত দূর তাহা নিরূপণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে ব্যক্তি অলস-মানস-প্রসূত দিবা-স্বপ্নকে আশা মনে করে, মাত্র সেই আশার শেষ সীমা দেখিতে পায়, এবং "মধুর কোমল-কান্ত" যৌবন গত হইলে নিরাশ হৃদয়ে অনুতাপ করে। কিন্তু ইপ্সিত লাভে যাহার জীবন পর্য্যন্ত পণ, সে যত আশা করে ততই উন্নত হইতে থাকে। আশার শেষ সীমা নিরূপণ তাহার অসাধ্য।

মনুষ্যের সুখ সসীম নয়, সুতরাং আশা সীমাবদ্ধ থাকে না, ইতস্ততঃ

নিভৃত হয়, অসন্ত বায়ুরাশির উপর ভর দিয়া জগতে জগতে উড়িয়া বেড়ায়। প্রতিভাযুক্ত মন,সেই আশার অনুবর্ত্তী হয়, এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার গমনমার্গ পরীক্ষা করে, তৎপর শক্তিকে সেই পরিমাণ উত্তেজিত করিয়া দুর্ব্বলের অগম্য স্থান লাভ করে। যাহার শোণিতে উষ্ণতার অভাব, কিছুতেই উত্তেজিত হয় না; ধ্রুব নক্ষত্রের অপর পার্শ্ববর্ত্তিনী অত্যুচ্চ আশার অনুগমনে অসমর্থ, সুতরাং উড্ডীয়মানা আশার পক্ষযুগে প্রস্তর বাঁধিয়া দেয়।

ভারতে শক্তির অভাবে আশার অভাব, একথা নিতান্ত অলীক। চেষ্টায় আলস্য-সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভারতে নিরাশার এই মাত্র কারণ। আশার সঞ্চার হইতেই "পরিশ্রম করিতে হইবে" এই ভাবনা মনে উদয় হয়, সুতরাং "আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা আশা না করাই ভাল" এইরূপ বিতর্ক সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। মনে কর নানা কারণে আশা বিফলা হইল। তখন দেখিতে হইবে সুখের মূলোচ্ছেদ হইল কি না? একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জ্ঞানোপার্জ্জনে যে সুখ হয়, উপার্জ্জিত জ্ঞান বিনিময়েও সে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "বড় হইব" আশায় মনে যে আহ্লাদ ও উৎসাহ থাকে, বড় হইলে তত থাকে না। সাধারণতঃ উন্নতাবস্থায়ই তত আহ্লাদ ও উৎসাহের অভাব। সুতরাং নিরাশ হইলে আশা করিবার সম্বল সম্মুখেই রহিল, এইরূপ অনুধাবন করিলেই মনে সুখ ও উৎসাহ জন্মে।

একথা বলা যাইতে পারে ভারত কখনও আশা করিয়া নিরাশ হয় নাই। যখন ভারতে আশা ছিল উন্নতিও ছিল। রঘুবংশীয়গণ উন্নতির আশায় উত্তেজিত হইয়া বীরদর্পে বিপক্ষবিজেতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যবনের অভ্যুদয় প্রারম্ভে অগ্নিকুলোজ্জ্বল বীরগণ তাহাদিগকে খর্ব্ব রাখিয়াছিলেন। তখন ভারতের যেমন বহিঃস্রোত ছিল অন্তঃস্রোতও তেমনই ছিল। কবিগণ কল্পনা সঙ্গে উড্ডীয়মান হইয়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের অপর পার্শ্ব হইতে অতল জলধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এবং

মনোহর বিলাস ভবন হইতে অন্ধকারাবৃত গিরিগহ্বর পর্য্যন্ত এবং ততোধিক অপরিজ্ঞাত মানব হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। দর্শনের অন্তস্তত্ত্ব দর্শন করিয়া দার্শনিকগণ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লাভ করিতেন। সেই উন্নতির সময়ে গণিত শাস্ত্র, ভারতবর্ষ তুঙ্গ গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক হিমাচল-শৃঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপন উন্নত মস্তক পাশ্চাত্য জাতি সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিল। তখন নিরাশা কোথায়? কোন্ বিভাগে আশা বিফলা?

যখন এত দিন নিরাশার কারণ হয় নাই, তখন আলস্য পরতন্ত্রতা অপবাদ হইতে মুক্তিলাভার্থ বৃথা ছলানুসন্ধান উপহাসের কারণ মাত্র।

অনেকে বলেন, আমাদের এত অভাব, যে আমরা সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে পারিব না। এটী গুরুতর ভ্রম। অভাবই উন্নতির ভিত্তিভূমি। রোমের স্বাধীনতা লোপ হইলে নরমাংস প্রিয় পিশাচবৎ সম্রাটগণ সমস্ত ইয়োরোপ ব্যতিব্যস্ত করিল, অভাবে সর্ব্বস্থান হতাশপূর্ণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ড অন্ধকারাবৃত। উপর্য্যুপরি উপপ্লবে সকলের মন দৃঢ় হইল। অভাবে মুদ্রাযন্ত্রাদির আবিষ্কার এবং উপায় চিন্তনে অন্যান্য সুবিধা উদ্ভাবিত হওয়াতে সাধারণের মন দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিল। সুতরাং উন্নত না হইবে কেন? যেমন অন্ধকার গৃহে একটী আলোক জ্বালিলে সমস্ত গৃহ আলোকময় হয়, ইয়োরোপেও তাহাই হইল। আশানল অন্তরায় নিবন্ধন দীর্ঘকাল প্রধূমিত হইতেছিল, হঠাৎ এক পার্শ্ব হইতে জ্বলিয়া উঠিল। অমনি যেন দৈববলে সমস্ত ইয়োরোপ আলোকময় হইল। আমরা পৃথিবীতে যত যন্ত্র, যত কৌশল দেখিতে পাই, সে সমস্তই কি অভাববৃক্ষের ফল নয়? প্রাচীন ইহুদী জাতির ন্যায় যে জাতি যত উপক্রত উৎপীড়িত ও উৎক্রান্ত থাকে, তাহার উন্নতি তত দ্রুত।

সুনীতি পরায়ণ ও সৎশিক্ষা প্রদ ইংরেজের অধিকারে ভারতবর্ষে

আশার সঞ্চার দেখা যাইতেছে, উন্নতির বীজও উপ্ত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানী বৃদ্ধ যাহা চিন্তাও করেন নাই, আজি অজাতশ্মশ্রু বালক তাহার আলোচনা করিতেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক রাজনীতি এক্ষণে অনুশীলন করা সাধারণের কার্য্য হইয়াছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে অধীত হইতেছে। কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত উন্নতির কারণ নহে, চিহ্ন মাত্র। আমাদের প্রত্যেক ধমনীতে অভাব রহিয়াছে, তথাপি উন্নতি হয় না কেন? অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের অভাব গুলিন দূরীকরণে চিন্তা বা চেষ্টা করি না বলিয়া উন্নতি হয় না। সে দোষ কেবল রাজপুরুষগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কার্য্য হয়। আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণ অপেক্ষা আমাদের আলস্য দোষই এজন্য নিন্দনীয়। আমরা বস্ত্র পরিধান করিব, আমরা তাহার জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য নই, সে চিন্তায় মাঞ্চেষ্টারের নিদ্রা হয় না। লেখনী প্রস্তুত করিব তজ্জন্য বর্ম্মিংহাম ব্যস্ত। আমাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য ফরাশি ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, সুতরাং আমরা কেন আপন অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিব? আমরা অধ্যয়ন করিব তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সঙ্কলনে শ্বেতাঙ্গগণ দিন যামিনী পরিশ্রম করিবেন। তাঁহারা আপন আপন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন যাহা শিক্ষা দিবেন, সেই সমস্ত কথা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে, এবং আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকগণ তাহাই অপকৃষ্ট প্রণালীতে আংশিক শিক্ষা দিয়া আমাদের মনে অভিমানের বীজ রোপণ করিবেন। সুতরাং আমাদের উন্নতি কিসে হইবে?

আমরা বিনা পরিশ্রমে সকল বস্তু লাভ করিতেছি বলিয়া আমরা সুখী হই নাই। মনে যেমন আশা ও স্ফূর্ত্তির অঙ্কুর দেখা যায়, তেমনই আবার আপনাদিগকে ভুলিয়া আছি, সুতরাং কেবল আমাদের নিজের নহে, আমাদের পুত্র পৌত্রাদিকেও অলস ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া চিরদিনের

জন্য তাহাদের অসুখ উৎপাদন করিতেছি। অভাব সকল পরকীয় সাহায্যে অপনীত হওয়াতে আমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিতেছি; এবং জগদীশ্বর যাহাকে যে কিছু বুদ্ধি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কূর্ম্মের ন্যায় আপনি আপনাকে লুকায়িত আছি। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উন্নতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়াছিল, এবং যাহার বীজ পুনর্ব্বার এই ক্ষেত্রে পতিত হইয়া আপনা আপনি সুফল উৎপাদন করিবে এরূপ আশা ছিল, তাহা আমরা যত্ন করিতে ভুলিয়া আছি।

ভারত ভূমি কি অনুর্ব্বরা বা অসার? তাহা নহে। আশাই প্রধান সার, তাহার অভাবই সকল অনিষ্টের মূল। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভা-বের সহিত আশা ও চেষ্টার অভাব সংযুক্ত থাকাতে ভারতের অব-নতি। কে যত্ন করিয়া ভারতক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ বপন করে? কেই বা প্ররোহাপেক্ষী? কেই বা বারি সিঞ্চনে রত? যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে সে বালকবৎ। বালক স্বহস্তে বীজ রোপণ করে, ভূমির উপযো-গিতা পরীক্ষা করে না। তাহার প্ররোহ-দর্শন-লালসা এত বলবতী হয় যে, প্রতিদিন তিন চারি বার উৎপাটন করিয়া নিরীক্ষণ করে, সুতরাং বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের এক্ষণে বালকতা। উপযুক্ত আশা নাই, উদ্যোগ নাই। ভারতে বার্ক্ নাই, পিট্ নাই, সিসিরো নাই, ডিমস্থিনিস নাই, যাঁহার বাক্যে চেষ্টা ও আশা যুগপৎ উত্তেজিত হইতে পারে এমন কেহই নাই। যখন নেপোলিয়নের প্রাদু-র্ভাবে ইয়োরোপ সহ ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত, সমস্ত রাজ্য সকল মহাদেশ জেতার পদানত, ব্রিটনীয়গণ নিরাশায় ভগ্নহৃদয়। রাজমন্ত্রী পিট সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সকলকে আশামন্ত্রে কবচ ধারণ করাইলেন; ব্রিটন সমস্ত বিপদ অতিক্রম এবং বিপক্ষের উন্নতি ও অভ্র যুগপৎ অবজ্ঞা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভারতে কিছু নাই, অথচ আশার নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সকলই আছে। মনুষ্যের জীবন-বাণিজ্যে পরিশ্রম মূলধন, আশা সমুদ্র। বহি-

বাণিজ্য উন্নতির মূল। সুতরাং উন্নতি করিতে হইলে আশা-সমুদ্রের দূরবর্ত্তী দ্বীপসমূহে শক্তি-পোত সহযোগে বাণিজ্য করিতে হইবে, নতুবা ভারতে উন্নতি নাই।

উন্নতি এক দিনের কার্য্য নয়। যদি এক সময়ের লোকের যত্নে সাধারণের মনে আশার উদ্রেক হয়, তাহার পরের শ্রেণীর লোকেরা উন্নতির মূল স্থাপন করিতে পারে। যদি স্বরোপিত বৃক্ষ অসময়ে উৎপাটিত না হয়, যদি পরিপক্কাবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে, তবে ক্রমে মুকুল হইতে পুষ্প হইবে, ফুল হইতে ফল হইবে, বিজ্ঞান আবার ভারতবৃক্ষের শাখায় শাখায় শোভা পাইবে।

প্রকৃতিতেও কিছুই অসম্ভব নাই। পর্ব্বতে শিবজী জন্মে, জলজ বৃক্ষে রণজিৎ ফল আশ্চর্য্য নহে। যে ভূমিতে কালিদাস, মাঘ, ব্যাস, বাল্মীকি ভবভূতির জন্ম, যে ভূমিতে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কপিল, গৌতমের আবির্ভাব, যে স্থানে রাম, যুধিষ্ঠির রাজ্য করিয়াছেন; মৈত্রী, গার্গী, খনা, লীলাবতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; এ সেই ভারতভূমি। হিমাচল যাহার সীমাস্থলবর্ত্তী পর্ব্বত, গঙ্গা, যমুনা নদী, বেদচতুষ্টয় ধর্ম্মপুস্তক; রামায়ণ মহাভারত, মনুসংহিতা, পুরাণাদি গ্রন্থ যাহার অঙ্গভূষণ; যে দেশে সীতা, সাবিত্রী ললনার আদর্শ; ভীষ্ম, পার্থ ধনুর্দ্ধর; এ সেই ভারতবর্ষ। তবে আমরা আশা করি না কেন? আজি যদি অনন্ত সমুদ্র গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া ভারতভূমি প্লাবিত করে, আমরা আশাজেলকে বক্ষ রক্ষা করিয়া কূলপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে বিশেষরূপে অনুমোদন করিব। অশ্রুবিসর্জ্জন মাত্র উন্নতির পথ বলিয়া কাহাকেও নিরাশহৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে উপদেশ দিব না।

পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার।

মনুষ্য-মনের সুখ সম্পাদনার্থ চারিদিকে কতপ্রকার পদার্থ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম মীমাংসা, গণিতের অব্যর্থসিদ্ধান্ত, কাব্যের কুসুম সুকুমার বর্ণনা, ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অতীত চিত্র প্রভৃতি, স্থপতি ভাস্কর বিদ্যাদির নয়নরঞ্জন, কারুকার্য্য এ সমস্তই সুখপ্রদ। কিন্তু শিক্ষিত-মন জগতের নৈসর্গিক ঘটনাবলী এবং পদার্থ সকল পরিদর্শন করিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতে পারে, তাহার নিকট বিজ্ঞানশাস্ত্রও পরাস্ত,—ঈশ্বরের অনন্তসৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের নিকট সকলই তুচ্ছ। নিম্নলিখিত আবিষ্কার বিবরণটী পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কয়েকটী অনিবার্য্য দৈবঘটনা উপস্থিত হওয়াতে উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কারার্থ প্রেরিত জাহাজের অধিকাংশ লোক ও নাবিকগণ কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহারা অবশিষ্ট ছিল অধ্যক্ষের উপরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য অতিশয় দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে জাহাজে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং স্থলপথে প্রস্থানের চেষ্টা করিয়া একে একে তুষার মধ্যে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। জন্‌সন্ নামক এক জন বিশ্বস্ত নাবিক মাত্র জাহাজ ভস্মীভূত হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বস্তু যে পর্য্যন্ত পারিল তীরে উঠাইল। জাহাজের নাম ফরওয়ার্ড্ ছিল। তাহার অধ্যক্ষ জন হাতারস, ডাক্তার ক্লবনি এবং বেল্ নামক এক সূত্রধরের সহিত স্থলপথে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা পরপয়েজ নামক আমেরিকা হইতে আবিষ্কার জন্য প্রেরিত জাহাজের অধ্যক্ষ আল্‌তামন্ড্ নামক এক ব্যক্তিকে মৃতকল্প অবস্থায় তুষারের নীচ হইতে উঠাইয়াছিলেন। দূর হইতে ধূমরাশি দেখিয়া অপরিচিত

মুমূর্ষুকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহাদের অবলম্বন, যশোলিপ্সার ভিত্তিভূমি, দীর্ঘকালের প্রিয়-নিকেতন ফরওয়ার্ড নামক জাহাজ খানি ভস্মীভূত হইতেছে, জনসন্ নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ক্ষুদ্র এক খানি জাহাজ পরপক্ষের ভস্মাবশেষে প্রস্তুত পূর্ব্বক সংগৃহীত বস্তু সকল লইয়া সকলে তাহাতে আরোহণ করিলেন। চেষ্টার আল্‌ৎমন্দ্ও সুস্থ হইলেন। অধ্যবসায়শালী পাঁচজন তখনও অবিচলিত উৎসাহের সহিত মেরুক সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক পৃথিবীর শেষ সীমা দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

কিছু দিন উত্তরাভিমুখে গমন করার পর এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক প্রকার কোয়াসার ন্যায় পদার্থে সমুদ্র ও আকাশ সংমিলিত দেখা গেল, ঐ পদার্থ বহুদূরবর্ত্তী ছিল। তাহা মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত অন্তর্হিত ও প্রকাশিত হইতে দেখিয়া মেঘ নয় এ কথা সাব্যস্ত হইল। হাতারস্ সর্ব্বদাই দূরবীক্ষণ হস্তে বসিয়া থাকিতেন, তিনিই প্রথমতঃ ঐ দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরিশেষে নবাবিষ্কৃত দেশভাগ যখন অবধারিতরূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন "মেরুভূমি" "কেন্দ্রভূমি" বলিয়া উল্লাস শব্দে দশদিক ব্যপ্ত হইল। বিদ্যুৎবৎ দ্রুতবেগে এই কথা সঙ্গীবর্গের কর্ণগোচর হইলে সকলে বেগে অধ্যক্ষের দিকে ধাবমান হইয়া দূরবীক্ষণ সহযোগে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার ক্লবনি সেই ধূমবৎ পদার্থ মধ্যে আলোক দেখিয়া দৃষ্টপদার্থ আগ্নেয়গিরি বলিয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, দক্ষিণ কেন্দ্রে যেমন ইরিবস্ ও টেরর্ নামে দুইটী আগ্নেয় পর্ব্বত জেমস্ রস্ আবিষ্কার করেন, উত্তর কেন্দ্রেও সেইরূপ আছে।

ক্রমে তীরভূমি সমীপস্থ হইল, আর চব্বিশ ঘণ্টা চলিয়া গেলে পৃথিবীর শেষ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে কেহ যাহা কখনও করে নাই, সেই অলৌকিক কার্য্য সাধন হইতেছে দেখিয়াও কাহারও মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সকলেই চিন্তামগ্ন এবং অচারিত-

চরণ-প্রদেশ কিরূপ স্থান তাহা কল্পনায় নিরত রহিল। পশুপক্ষীও এ স্থানে বাস করিতে পারে না, একে একে সকলগুলিই সন্ধ্যা আগত দেখিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে; মৎস্যগুলিও দক্ষিণদিকেই ধাবিত হইতেছে। প্রাণি-সমাগম শূন্য নির্জীব প্রদেশে উপস্থিত হওয়াতে নির্ভীক হৃদয়েও ভয়ের তরঙ্গ উত্থিত হইল। নানারূপ ভাবনায় অবসন্ন হইয়া হাতারস্ ব্যতীত অন্য সকলেই নিদ্রিত হইল।

অধ্যক্ষ পোত্তের কর্ণ ধরিয়া রহিলেন, জাহাজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। তাঁহার বাসনা ছিল, কোনরূপে জাহাজের গতি রোধ না হয়। কিন্তু তাহা পারিলেন না, তিনিও নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে অতীত জীবনের ঘটনাবলী মনোমধ্যে উদয় হইল। ফরওয়ার্ড নামক জাহাজের ভস্মীকরণ ও মাল্লাদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, এবং গত কয়েক মাসের কষ্ট স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার হৃদয় নিরাশার মুর্ম্মুরদাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। তখন পৃথিবীর শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় পতাকা বিস্তার করিতেছেন, হৃদয়ে এই জয়োল্লাস উদয় হইয়া তাঁহাকে অতিশয় উৎফুল্ল ও সুখী করিল। সাহসী জাহাজাধ্যক্ষের দীর্ঘ জীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা-কুসুম সকল সংগ্রহ করিয়া স্মৃতি ও কল্পনা যখন এইরূপ মালা রচনা করিতেছিল, সেই সুমেরু সাগরাতীত প্রদেশে বাহ্য জগৎ তখন নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিল না। আকাশ নিবিড় নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অতি অল্প সময় মধ্যে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল। প্রভঞ্জনের ভীমস্বননে, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে সকলে জাগরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে রত হইল। হাতারস্ কর্ণ ধারণ করিলেন, জনসন্ ও বেল্ ক্লেপণীর সাহায্যে জাহাজ রক্ষায় যত্ন করিতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আবৃত থাকাতে দিঙ্‌নির্ণয় পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়ারও সুযোগ রহিল না।

ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টে অন্যে বিবেচনা করিত ঐশ শক্তির শেষ সীমা

দর্শন করা অনুচিত এ প্রযুক্ত এই দৈবদুর্ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, সুতরাং অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ নাবিকগণের অধ্যবসায়ব্যঞ্জক মুখশ্রী দৃষ্টে তাহারা যে জীবনকে নিতান্ত তুচ্ছ বোধ করে, ঝটিকা বা তরঙ্গ কাহারও নিকট পরাভব স্বীকার করিবে না, তখন তাহাই প্রকাশ পাইল।

অপরাহ্ণ ছয়টার সময় ঝটিকা থামিল। অমনি কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবশক্তি ক্রমেই যেন নিমেষ মধ্যে প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সুমেরু প্রদেশের চিরবিরাজিত কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব আলোক প্রকাশ পাইল। সেই বিদ্যুদ্দামবিনিন্দিত রমণীয় জ্যোতির্ম্মালায় চারিদিক রঞ্জিত করিল। কেহ আগ্নেয়গিরিজাত অগ্নিতেজ, কেহ প্রতিফলিত আলোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন তাহা নহে, এ একটী সৌবালোক-সম্ভূত দৃশ্য। অগ্রসর হইলে আমরা এই আলোকবৃত্ত অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বায় ঝটিকা ও অন্ধকারে উপস্থিত হইব।

হাতারস তথাপি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সূর্য্য শূন্য প্রদেশ ঝটিকার আন্দোলনে এবং গভীর অন্ধকারে আবার আচ্ছন্ন হইল। একবার মাত্র জাহাজ খানি আন্দোলিত করিয়া সেই ভীম বাত্যা এক দিকে চলিয়া গেল। তাহার পরক্ষণ হইতে জাহাজ খানি অনুকূল বায়ুবলে এমনই দ্রুত বেগে কেন্দ্রাভিমুখে চলিল যে সহসা বিপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু কাহারও বিবেক শক্তি ছিল না। অনিবার্য্য দুরাশায় সকলে উন্মত্ত ছিল, বিপদকে কেহ বিপদ জ্ঞান করিল না। সেই অপরিজ্ঞাত ভূভাগ দর্শনে অগ্রসর হইল।

অনন্তর তীরের সমীপস্থ হইলে শূন্যমার্গে নানারূপ আশ্চর্য্যদৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। কুজ্ঝটিকা বায়ুতে বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার মধ্য দিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রাকার পদার্থ দেখা গেল, সকলে আগ্নেয় গিরি সিদ্ধান্ত করিতেছে এমন সময় সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। সম্মুখে

তি ন মাইল অপেক্ষা ন্যূন ছিল, এমন সময়ে প্রতিকূল বায়ুতে জাহাজ পুনরায় বিপরীত দিকে লইয়া চলিল।

জাহাজের চল্লিশ হাত অপেক্ষা ব্যবধানে একটী বরফ স্তূপ প্রকাশ পাইল। তাহার পৃষ্ঠে কতকগুলি শুক্র ভল্লুক ভীত হইয়া বেড়াইতেছিল। স্তূপটী জাহাজেব দিকে আ্সিতে লাগিল। একবার সংলগ্ন হইতে পারিলে জাহাজ চূর্ণ হইয়া যায়। নিকটস্থ হইলে ভল্লুক গুলি জাহাজো-পরি লাফাইয়া পড়ে,—ভয়ঙ্কর বিপদ্। প্রায় ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত স্তূপটী পোতসঙ্গে গমন করার পর একবার বায়ুর তাড়নে দূরে বিক্ষিপ্ত হও-যাতে জাহাজ খানি রক্ষা পাইল।

ঝটিকা দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইয়া আবিষ্কারকগণের ক্ষুদ্র জাহাজ খানি উড়াইল, বায়ু মার্গে সঞ্চালিত হওয়াতে একটী বৃহৎ শ্বেত পক্ষীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ঘূর্ণায়মান জলরাশির একটী আবর্ত্তের প্রবল আকর্ষণে জাহাজ খানি তাহার মধ্যগত হইল। নিমেষ মধ্যে এত নিম্নে দেখা গেল যে জাহাজ বাঁচিবার সম্ভাবনা রহিল না। আব-র্ত্তের চারি দিকে জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। মুহূর্ত্ত জন নির্ভীক নাবিকগণের হৃদয়েও ভীতি আসিল। সৌভাগ্যক্রমে এক বার জলের তাড়নে, বামান নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হও-যাতে জাহাজ রক্ষা পাইল। আল্‌তামন্দ্‌, জনসন, ডাক্তার বেল্‌ সকলে [illegible] যখন দণ্ডায়মান হইল, দেখিল হাতারস নাই। তখন রাত্রি ২টা বাজিযাছে।

যাহার প্রযত্নে ডাক্তার ক্লবনি ও তাহার সঙ্গীযগণ পৃথিবীর শেষ সীমা দেখিতে পাইলেন, তিনি হঠাৎ এইরূপ অন্তর্হিত হওয়াতে সক-লের হৃদয়ে কেমন শোক ও ক্লেশ হইল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জল মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিফল অনুসন্ধানের পর স্থল-ভাগ পরিদর্শনে মনস্থ করিলেন। ১৮৬১ সনের ১১ জুলাই রাত্রি ৫ টার সময় কেন্দ্রভূমি তিন মাইল ব্যবধানে দেখা গেল। পৃথিবীর উত্তর

কেন্দ্রস্থ আগ্নেয়গিরি সদৃশ এই নবাবিষ্কৃত ভূভাগ মাল্যাকারে কেন্দ্রটী বেষ্টন করিয়া আছে বোধ হইল।

আগ্নেয় গিরিটী অতি চমৎকার। ইহা হইতে কিছু কিছু অগ্ন্যুদ্গম সর্ব্বদাই হইতেছে। প্রস্তর ও দ্রব ধাতু অনবরত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের উচ্চতাক্রমে বাড়াইতেছে। সময়ের আবর্ত্তনে যখন কোন প্রবল অগ্ন্যুদ্গম উপস্থিত হয়, তখন পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে রণক্ষেত্রের সহস্র কামান গর্জ্জনের ন্যায় প্রভৃতি কঠোর ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে থাকে। অগ্নিময় ধাতু ও অঙ্গার স্রোত আকাশে বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহু দূরে বিকীর্ণ হয়। তখন ধূমরাশির মধ্য দিয়া এক দিকে অগ্নিশিখা সর্পাকারে সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়, অন্য দিকে দ্রবধাতু স্রোতে পতিত হইয়া গহ্বরবৎ স্থান সকল পূর্ণ করিয়া ফেলে, উপরে রক্তবর্ণ ধূমরাশি, নিম্নে অগ্নিময় স্রোতস্বতী, চারিদিকে বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত। স্রোত সমুদ্রে পতিত হয়, সেই প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অধ্যবসায় সম্পন্ন যাত্রিগণের আশার শেষ সীমা, পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি এইরূপ স্থান।

আগ্নেয়গিরির একটীমাত্র গহ্বর দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইত। উদ্গত অগ্নিশিখার অগ্রভাগে বিদ্যুতবৎ আলোক প্রকাশ পাইতে দেখিয়া তাড়িতের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকা অনুমান হইল। নিদাঘ কাল। দক্ষিণদিকে যে রেখার ন্যায় সূর্য্য হইতে রশ্মি প্রকাশ পাইত, তাহা ধূমের গাঢ় আবরণে এরূপে আবৃত ছিল যে চারি দিক অন্ধকার দেখা গেল। সুমেরু সমুদ্রমালায় পরিবেষ্টিত এই সুমেরুপর্ব্বত ছয় সহস্র ফিট উচ্চ, প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গিরি হেক্লার সমান। সমুদ্র হইতে ক্রমে হেলিয়া পর্ব্বত উচ্চ হইয়াছে। সেখানে বৃক্ষাদির চিহ্নমাত্রও নাই, পদস্থাপনের উপযুক্ত মৃত্তিকাও দেখা গেল না।

জাহাজ তীরস্থ হইলে জন হাত্তারসের কুকুর ডাক্ এক লম্ফে পতিত

হইয়া প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিয়দ্দূর ব্যবধানে গিয়া অতি-শয় আর্ত্তস্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাঁহার সঙ্গীগণ সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হাতারসের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগি-লেন। অধ্যক্ষ মুমূর্ষুবৎ পতিত ছিলেন। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ রবে, সঙ্গীগণের পরিচিত কণ্ঠস্বরে হাতারস চৈতন্য লাভ করিলেন। বলি-লেন, "আমি জীবিত আছি। এই কুইন্স আইলন্দে (রাজ্ঞীর দ্বীপে) জীবিতাবস্থায় রহিয়াছি।" দ্বীপটীর নাম কুইন্স আইলন্দ রহিল।

"ইংলণ্ডের জয় হউক" বলিয়া সকলে যুগপৎ জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। ক্লবনি, আলতামন্দ ও হাতাবসের দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া "আমেরিকারও জয় হউক" বলিয়া উচ্চৈঃশব্দ করিলেন।

হাতারস সুস্থ হইলে বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আপনার সুখ হইয়াছে ত ?"

হাতারস্ বলিলেন "হাঁ, তোমরা সুখী হও নাই ? এখানে আসি-য়াছ একি সুখকর নয় ? আমরা যে ভূমিতে বিচরণ করি এ মেরুভূমি। যে বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করি, এ কেন্দ্র প্রদেশের বাতাস। যে সাগর অতিক্রম করিয়াছি, এ সুমেরু সমুদ্র। আহা এই সেই উত্তর কেন্দ্র !"

জাহাজাধ্যক্ষ আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, অনেক চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াছিল, বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। ক্লবনির পরামর্শমত তাহার উদ্যোগ হইল। সকলে আহার করিলেন। গণনা দ্বারা দেখা গেল ঐ স্থানের অক্ষাংশ ৮৯° ৫৯′ ১৫″ ছিল। হাতারসের আদেশমত লিখিত হইল।

"১৮৬১ সনের ১১ই জুলাই উত্তরাক্ষাংশ ৮৯° ৫৯′ ১৫″ সেকেণ্ড উত্তর কেন্দ্রে লিভারপুলবাসী করওয়ার্ড নামক জাহাজের অধ্যক্ষ জন হাতারস এই কুইন্স আইলন্দ আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং ও তাঁহার সঙ্গীগণ এই লিপি প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করিলেন। যে কেহ ইহা প্রাপ্ত হই-

যেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে আড্‌মিরাল্‌টিতে (যুদ্ধ জাহাজের কার্য্য সাধক রাজমন্ত্রীর নিকট) পাঠাইয়া দেন।"

দস্তখত।

জন্‌হাতারস	ফরওয়ার্ড জাহাজাধ্যক্ষ।
ডাক্তার ক্লবনি।	
আল্‌তামন্দ্‌	পব্‌পাযেজ্‌ নামক জাহাজাধ্যক্ষ।
জন্‌সন্‌	মাল্লা।
বেল্‌	সূত্রধর।

অনন্তর আহারে বসিয়া হাতারস বলিলেন "এই ৮৯° ৫৯′ ১৫″ সেকেণ্ডে বসিয়া আহার করিতে কে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অসিতে ইচ্ছুক না হয়?"

প্রাচীন বা বর্ত্তমান কালে ইয়োরোপ, আসিয়া বা আমেরিকাবাসী কেহ যাহা কখন করে নাই তাহা সম্পাদিত হইল।

অনন্তর কেন্দ্র সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তার বলিলেন "পৃথিবীর মধ্যে এই স্থান এবং দক্ষিণ কেন্দ্র মাত্র অচল, অন্য সমস্ত স্থান অতি দ্রুতগতিতে ঘুরিতেছে। ইহার ব্যাস রেখার চারি দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার এবং সূর্য্যের চারি দিকে সম্পূর্ণ বৎসরে একবার আবর্ত্তন করে। ব্যাস রেখার দুই প্রান্তই দুই মেরু। পৃথিবীর এইরূপ গতি না থাকিলে দিবা রাত্রি বা ঋতু পরিবর্ত্তন হইত না। আমরা সাড়ে চৌষট্টি দিনে সূর্য্যের মধ্যে পড়িয়া যাইতাম। এই পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯,৫০,০০,০০০ মাইল দূরবর্ত্তী।"

"আমি যে কেন্দ্রদ্বয় অচল বলিয়াছি ঠিক্ তাহা নহে। অন্যান্য অংশের সহিত তুলনায় অচল বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার যে গতি আছে তাহা এত মন্দ যে, ২৬,০০০ বৎসরে একবার মাত্র ঘুরিতে পারে।"

হাতারস এই সকল বিজ্ঞানবিতর্ক শুনিতেছিলেন না, তিনি গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

কেন্দ্র সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত বিশ্বাস ছিল, তন্মধ্যে একটী অত্যন্ত আশ্চর্য্য। অনেকে বলিত কেন্দ্র স্থলে একটী বৃহৎ গহ্বর আছে, সেই গহ্বর পথে পৃথিবীর ভিতর দিয়া, ঠিক্ মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। জন হাতারসের আবিষ্কারে সেই ভ্রম একেবারে দূর হইল। সেই অপরিজ্ঞাত অদৃষ্ট ভূভাগ যে অন্ধকারে আবৃত ছিল তাহা আলোকিত হইল। সকলে সুখে বিশ্রাম করিল, নিদ্রা গেল, কিন্তু হাতারসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। সেই প্রাণী-সমাগম-শূন্য বৃক্ষাদি বর্জ্জিত পঞ্চ ভূতের ক্রীড়া নিকেতনে হাতারস শান্তিহীন, বিশ্রামহীন। পৃথিবীর শেষ সীমা দেখিয়াও তাঁহার আশার শেষ নাই। সকলে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিল, অধ্যক্ষ তাহার পূর্ব্বেই পর্ব্বতপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দূরবীক্ষণ হস্তে দূরত্ব পরীক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্গীযগণ নিকটস্থ হইলে তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন একবার এই দ্বীপটী বেষ্টন করিয়া আসি। অনন্তর তিনি সম্মুখে যে ৪৫॥ সেকেণ্ড অর্থাৎ তিন পোয়া মাইল পথ অবশিষ্ট ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া ৯০° ডিগ্রীতে ঠিক কেন্দ্রের উপর ইংলণ্ডের পতাকা বিস্তার করিতে নিরতিশয় উৎসাহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কাহারও অনুনয় বা অনুরোধ মানিলেন না, জেদ্ করিতে লাগিলেন।

হাতারস্ পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলেন, অন্যান্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। একে একে তাহারা সকলেই অবসন্ন হইল, কিন্তু অধ্যক্ষের ক্লান্তি বোধ নাই, ক্লবনি বার বার নিষেধ করিলেন, সে নিষেধ কে শুনিবে? হাতারসের বোধ শক্তি ছিল না, তিনি উন্মত্ত, সুতরাং উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি এক লম্ফে একটী অগ্নিময় স্রোত অতিক্রম পূর্ব্বক সঙ্গীয়গণের ধরিয়া রাখার চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন। কেবল ডাক্ নামক প্রভুভক্ত কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অধ্যক্ষ বন্ধুগণকে "এই পর্বতের নাম হাতারস্ মনে রাখিও" এই কয়েকটী কথা বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

এক এক বার অগ্নির দুঃসাহ উত্তাপে এবং শ্বাসরোধক ধূমের উপদ্রবে ক্রবনি প্রভৃতি সকলে অস্থির হইতে লাগিলেন, হাতারসের অদৃষ্টে কি আছে তাহা মনেও ধারণা করিতে পারিলেন না। কিন্তু হাতারস্ ইংলণ্ডের পতাকা নাচাইতে নাচাইতে কুকুরসহ আরোহণ করিতেছেন, এক এক বার তাহা দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন, কুকুরটী দূর হইতে মূষিকবৎ ক্ষুদ্র দেখা যাইতে লাগিল।

আলতামন্দ্ আর থাকিতে পারিলেন না। যাঁহার অনুগ্রহে তুষার মধ্যে মরণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার জীবন রক্ষার্থে এক লম্ফে অগ্নির নির্ঝর অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইলেন। হাতারস বহু উচ্চে উঠিয়া যন্ত্রের সাহায্যে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ গণনা করিতেছিলেন, এক খণ্ড স্খলনোন্মুখ প্রস্তরে পা রাখিয়াছিলেন। প্রস্তর স্খলিত হইল, অধ্যক্ষও তৎসঙ্গে গড়াইয়া পড়িলেন, অদৃশ্য হইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল।

পবন গতিতে ডাক্ অবতরণ করিয়াছিল আলতামন্দ্ও অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রস্তরের উপর গড়াইয়া যখন এক গম্ভীর অগ্নিময় হ্রদে পতিত হইতেছিলেন, অমনি ডাক ও আলতামন্দ্ তাঁহাকে ধরিয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রাণরক্ষা হইল সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞানরত্ন চিরদিনের জন্য হারাইলেন। চক্ষু প্রস্তরবৎ নিশ্চল রহিল, সমীপস্থ বন্ধুবর্গকেও চিনিতে পারিল না। হাতারস্ বাতুল হইয়াছেন, তাঁহার বোধ শক্তি নাই।

পর দিন পর্ব্বত পার্শ্বে "জনহাতারস" এই নামটী খুদিয়া এবং উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার বিবরণ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহা এক টীনের নল মধ্যে সেই স্থলে রাখা হইল। অগ্ন্যুদ্গমে নষ্ট না হইয়া থাকিলে সেই কীর্ত্তি স্তম্ভ এখনও নীরবে হাতারসের যশোগান করি-

তেছে। অনন্তর তাঁহারা গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিয়া ২৩শে তারিখ ভিক্টোরিয়া উপসাগরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য প্রভিদেক্স দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শৃক্র ভল্লুকাদিতে তাঁহাদের সমস্ত সম্বল ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। তখন সেস্থানে শীতকাল যাপন দুঃসাধ্য দেখিয়া যে কিছু খাদ্য সামগ্রী ছিল সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিন অগ্রসর হওয়ার পর এক দিন দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের সঙ্গীয় ফবওয়ার্ডের বিদ্রোহী মাল্লাগণের মৃতদেহ বরফ মধ্যে পড়িয়া আছে। তাহাদের এত গুলি লোকের বিকৃত-বদন ও ভয়ানক পরিণাম দেখিয়া নাবিকগণের হৃদয়ে কি শোচনীয় ভাব উপস্থিত হইল, সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এই ভয়ানক দৃশ্য দর্শনের পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আবিষ্কারকগণের যে শোচনীয় কষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাহারা নিজেও বর্ণন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনাহারে সকলেই মৃতকল্প. আহার্য্য বস্তু নিঃশেষ হওয়ার পর সঙ্গীয় কুকুর গুলির মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করা হইয়াছিল ৪৮ ঘন্টা কাল জলও পান করিতে না পারিয়া পরিশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর উত্তর ডিভনের নিকট উপস্থিত হইলেন। জনসন্ ও বেল্ তখন মৃতকল্প।

কিছু দিন বরফ মধ্যে অনাহারে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সকলে ডেনমার্ক দেশীয় ধীবরের নৌকায় আরোহণ পুর্ব্বক জিলন্দে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে আল্‌তোনা ও হম্বর্গ পথে লণ্ডনে পঁহুছিলেন।

ডাক্তার ক্লবনি প্রথমতঃ রাজকীয় ভৌগোলিক সভায় সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন এবং হাতারসের লিখিত দলিল খানি উপস্থিত করিয়া আশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে সকলকে বিস্মিত করিলেন। সকলে তাঁহাদের অবিচলিত অধ্যবসায়ের ভুয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আবিষ্কারের বাসনা ইংলণ্ডে অতিশয় বলবতী! সামান্য পর্ণকুটীর

হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত আনন্দের কোলাহল উঠিল ; তারের বিদ্যুৎ-গতিতে, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে লোক মুখে, হাতারসের আবিষ্কার বৃত্তান্ত দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ডাক্তার ক্লবনি ইংলণ্ডেশ্বরীর এবং লর্ড চান্সেলরের (অত্যুচ্চ আদালতের অধ্যক্ষ) সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। যে সম্মান স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই তাহা লাভ হইল, গবর্ণমেণ্ট আবিষ্কৃত ভূভাগের "কুইন্স্ আইলন্দ" "আল্‌ভামন্দ হার্-বার্" এবং "হাতারস্ পর্ব্বত" নাম স্থির রাখিলেন।

হাতারসের বাতুলতায় কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। তিনি লিভরপুলের নিকটস্থ ষ্টেন্ নামক স্থানের একটী ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন। তিনি কথা কহিতেন না, যাহা বলা যাইত, তাহাও বুঝিতেন না ; বাক্ ও বিবেক-শক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে তাঁহাকে জীবন্মৃত করিয়াছিল। বাহ্য পৃথিবীর সহিত তাঁহার মাত্র একটী বন্ধন ছিল, সে বন্ধন ডাকের প্রতি ভালবাসা।

অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া এক বাগানে নির্দ্দিষ্ট এক দিকে ভ্রমণ করিতেন। প্রাচীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া গতিরোধ হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। কেহ তাঁহাকে থামাইলে তিনি অঙ্গুলি দ্বারা আকাশের একাংশ দেখাইতেন। কিন্তু ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইলে ক্রুদ্ধ হইতেন, ডাক্‌ও ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর ক্রোধ জ্ঞাপন করিত।

ডাক্তার ক্লবনি বন্ধুকে সর্ব্বদাই দেখিতে যাইতেন। এক দিন হাতারসের উদ্যান ভ্রমণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিযা কারণ অনু-সন্ধান করিলেন, বুঝিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন চুম্বকা-কর্ষণের শক্তির ন্যায় শক্তিক্রমে হাতারস্ ঐরূপ ভ্রমণ করেন।

রহস্য এই, জন্ হাতারস্ কেবল উত্তরাভিমুখেই গমন করিতেন।

"কি এবং কেন।"

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া পার্থিব পদার্থ নিচয় দেখিতে থাকে। প্রথমতঃ বাল্যকালের অজ্ঞানতার সময়, তখন ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু কথা কহিবার পূর্ব্ব হইতেই দেখিতে আরম্ভ করে। তখন কোন সুন্দর বস্তু নয়নসমক্ষে ধরিলে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। লাল বর্ণের বস্তু অধিক উজ্জ্বল দেখায়, বালক-চক্ষু তাহার প্রতিই অধিক ধাবিত হয়। অনন্তর কিছু কিছু শব্দ স্ফুরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শুনিতে থাকে, ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি তাহার পরে জন্মে এরূপ বোধ হয়। কারণ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় চক্ষুতে বস্তুর ছায়া প্রতিফলিত হয়, এই জ্ঞান লাভে কোন যত্ন করিতে হয় না ; স্পর্শ ও দর্শন, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অধিক সম্পন্ন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঘ্রাণ ও আস্বাদনের ভাল মন্দ বোধ কিঞ্চিৎ জন্মা আবশ্যক, তবে তিক্ত, অম্ল বা লবণ বস্তু রসনাগত হইলে বালক মুখভঙ্গী করে বটে, কিন্তু তাহা ভাল বস্তু হইতে মন্দ বস্তু প্রভেদ করিয়া নহে। ঐ সকল বস্তুর তীব্র আস্বাদনে বালক সময়ের প্রসুপ্ত ইন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে চৈতন্য করে, স্বাদহীন মৃত্তিকা, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ গোময় প্রভৃতি বালকে অনায়াসে খাইয়া ফেলে।

শিশুগণ কথা কহিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বেই অনেক বস্তু দেখিয়া লয়। ক্রন্দন এবং মা, বা, প্রভৃতি আধ আধ কথার সঙ্গে সঙ্গে একি, ওকি, এইরূপ অনুসন্ধান করার ও জানিবার বাসনা প্রকাশ পায়। পশ্বাদির স্বাভাবিক জ্ঞানের ন্যায় জানিবার বলবতী ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হয়। যখন 'কি' শব্দও উচ্চারণ হয় না, 'তি' হইয়া যায়, তখনও শতবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, এবং একে একে সকল বস্তু পরিচয় করিয়া লয়। অনাগত বুদ্ধি বালকের পৃথিবী পরিদর্শন হইতে প্রথমতঃ বস্তু সকলের নাম জ্ঞান আরম্ভ হয়, অনন্তর "কেন

হইল” এইরূপ কারণানুসন্ধানে নিরত থাকে। প্রত্যেক বিষয়ের কারণানুসন্ধান প্রবৃত্তি হইতে অন্তঃকরণে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, সেই জ্ঞানেই মনুষ্যকে অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ পদবীতে তুলিয়া দিয়া মনুষ্য নামের যোগ্য করে। প্রকৃতিপ্রণোদিত বালক 'কি এবং কোন' এই দুইটী শব্দ সম্বল লইয়া জীবনবর্ত্ম অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই দুইটী শব্দ সঙ্গে করিয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে। শব্দ দুইটী প্রথমতঃ বালকের কণ্ঠনিঃসৃত হইলেও মানব জীবনের অবলম্বন এবং সমগ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি। সংসার যখন নিতান্ত শিশু ছিল, কোন্ বস্তুর অভিধান কি, জানিত না, কোন পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম ছিল না, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ভিন্ন পদার্থ নির্দ্দেশ হইতে পারিত না, একে কোন শব্দ করিলে অন্যের তাহা বোধগম্য হইত না, তখন 'কি' শব্দের জন্ম। অভিধান পূর্ণ করা 'কি'র প্রথম ও প্রধান কার্য্য। মক্ষিকা ও মৎকুণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশ এবং সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত 'কি' শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাল্য কাল অবধি শিক্ষা আরম্ভ হয় সত্য, কিন্তু পৃথিবী এমনই বিস্তীর্ণ যে, সুদীর্ঘ জীবনেও "কি" ফুরায় না। মানব জীবন যদি সহস্র গুণ দীর্ঘ হইত, যদি ইহাতে আলস্যের অপব্যয় অথবা বিস্মৃতির মলিনতা না থাকিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া তথাপি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বস্তু, নূতন ঘটনা দেখা যাইত। সংসার পুরাতন হয় না, সৃষ্ট বস্তু-নিচয় ফুরায় না। চিরাভ্যস্ত সঙ্গীত অথবা জীর্ণ বসনের ন্যায় সংসারকে পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। অনন্তকাল পর্য্যন্ত 'কি' শব্দ সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাও, পদে পদে নূতন দেখিবে নূতন শুনিবে, 'কি' তৃষ্ণা নিবারণ করা অসাধ্য। যদি ধনের বা জীবনের আশা কমিয়া যায়, তথাপি জানিবার বাসনা হ্রাস হয় না, অবিরামবাহিনী কল্লোলিনীর ন্যায় জ্ঞানলালসা মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তাভিমুখে চলিয়াছে,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অন্ত নাই।

এই প্রবল অনুসন্ধিৎসা মানবগণের সকল সুখের মূল। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণাস্বাদন, আঘ্রাণাদি হইতে সর্ব্বদা জ্ঞান জন্মিতেছে; বিদ্যুতের দ্রুতগতি হইতেও অনেক শীঘ্র আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতেছি। আমরা একক হইয়াও প্রত্যেকেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাঁচ জনের ন্যায় পাঁচ দিক হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছি, তথাপি আশার বিরতি নাই। যদি এক 'কি' প্রশ্নের সদুত্তর লাভে সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলেও মানব হৃদয়ে শান্তি সুখের অনেক আশা ছিল, কিন্তু তাহা থাকি না। 'কি' শব্দে আমাদের অনেক স্বাধীনতা আছে; দশ জনে মিলিয়া কোন পদার্থ বা ঘটনার নাম যাহা রাখিতে ইচ্ছা হয় তাহাই রাখিতে পারি। কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্য একটী দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহার উত্তরে আমাদের অনুমাত্রও স্বাধীনতা নাই। কেবল কেহ যখন মনে মনে কোন এক সঙ্কল্প স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে, তাহাকে 'কেন এরূপ করিলা' জিজ্ঞাসা করিলে সে কারণটী স্বাধীন ভাবে বলিতে পারে, একটী কারণ দশ প্রকারে ব্যাখ্যাও করিতে পারে, নৈসর্গিক কার্য্য ও ঘটনাবলীর কারণানুসন্ধান সেরূপ নহে। সে সকল প্রশ্নের একই উত্তর, উত্তরদাতা নিসর্গ। প্রকৃতি নিঃশব্দে তোমার মানস-নয়ন সমক্ষে অঙ্গুলী দ্বারা উত্তর লিখিয়া দিতেছেন, তোমার নয়ন মেলিয়া পাঠ করিতে হইবে।

আমরা কোন একটী অবস্থা বা ঘটনা দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি "এরূপ কেন হইল?" একটী নূতন বস্তু দেখিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম লোকে তাহাকে হরিদ্রা বলে; "এই বস্তুটী কেন হইল?" এ প্রশ্নের এক উত্তর, মনুষ্যাদির কার্য্য সাধন ও ব্যবহার জন্য। দ্বিতীয় উত্তর নিতান্ত কঠিন, মানব বুদ্ধির অগম্য, মনুষ্য কেবল এই মাত্র বলিতে পারে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হইল; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা করার উদ্দেশ্য কি? কে বলিবে? মানব-হৃদয় একটী ক্ষুদ্র প্রস্রবণ মাত্র, কোন অপরিজ্ঞাত কারণে সেই হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইলে

মলিন অশ্রুধারা বহিতে থাকে, অন্যো সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর ধারা দুইটী অনুসরণ করিতে পারে না, কোন্ লবণময় হ্রদ বা উৎস হইতে দুঃখ-স্রোত নির্গত হইয়াছিল, সকল বিবরণ অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহা নির্ণয় করিতেও সক্ষম হয় না। সুতরাং যে অনন্ত প্রস্রবণ হইতে অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যাহার একটী ধারায় সমগ্র সৌরজগৎ নিমেষ মধ্যে ভাসিয়া যাইতে পারে, এমন কে আছে, যে, তাহার মূলদেশ প্রাপ্ত হইবে? কারণানুসন্ধানের চরম সীমা পরমেশ্বর, মনুষ্য জ্ঞানের শেষ সীমা জগদীশ্বর, দূর হইতে ছায়া মাত্রেও সেই সীমান্ত স্থান লক্ষ্য হয় না।

হরিদ্রার একটী বর্ণ আছে, চুণের আর একটী বর্ণ আছে;—একটী অন্যটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, প্রায় বিপরীত। অথচ এই দুইটী বস্তু একত্র মিশাও, তৃতীয় এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্তু কয়টী সংযোগে নানা বর্ণের বারুদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে সেই ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ পায়; এরূপ রূপান্তর বা গুণান্তরের কারণ কি? স্থির মনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং সাধ্যমত যত্ন পূর্ব্বক মীমাংসায় প্রবৃত্ত হও। রাসায়ন শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব এই সকল বস্তুর সংযোগ ও বিযোগানুসন্ধানে নিহিত রহিয়াছে।

যে বর্ণের বিষয় বলিলাম, সেই বর্ণই কি? বর্ণ বস্তু হইতে প্রভেদ করা যায় কি না? বর্ণ সূর্য্যালোকে, বস্তুতে, লোক চক্ষে, না লোক মনে থাকে? বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ এ সমস্ত নিতান্ত আবশ্যকীয় প্রশ্ন। আমরা রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে বস্তুর বর্ণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। বহুকোণী কাচ চক্ষে দিয়া দেখিলে একত্রে নানা বর্ণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। রামধনুতে পৃথক পৃথক সাতটী প্রধান বর্ণ দেখা গিয়া থাকে। রৌদ্রের সময় ফুৎকার করিলে মুখনিঃসৃত জলকণা সকলে রামধনুর ন্যায় বর্ণ ও আকার দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বর্ণ বা আকারের কারণ কি? যখন কেহ

দেখে না, এরূপ অবস্থায় স্থিত অরণ্য মধ্যে গোলাপ পুষ্পের বর্ণটী তাহার সঙ্গে থাকে কি না? যদি সূর্য্যের তেজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ থাকে, তবে প্রত্যেক বস্তুতে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ পায় না কেন? এসকল মনোবিজ্ঞানের কঠিন প্রশ্ন। যে একবার ভালরূপে চিন্তা না করিয়াছে, বুঝাইলেও তাহার বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। এইরূপ দুই চক্ষে দৃষ্টি করি, চক্ষুর্দ্বয় মধ্যে দুইটী প্রতিবিম্বই অঙ্কিত হয়, অথচ আমরা একটী বস্তু দেখিতে পাই, অঙ্গুলী পীড়ন দ্বারা একটী চক্ষু কেন্দ্র-ভ্রষ্ট করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে বা নীচে সরাইয়া দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক বস্তুর দুই দুইটী মূর্ত্তিই পরিগ্রহ হইবে। এসকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, ঐরূপ অবস্থা কেন হয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখ, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। মনে একবার অনুশীলন ক্ষমতা জন্মিলে নিতান্ত কঠিন বিষয়ও সহজ বোধ হয়। যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তেমনই আবার তাহার সদুত্তরও প্রকৃতিতেই রহিয়াছে। নিসর্গ এক বহু ব্যাপক গ্রন্থ, সাবধানে পাঠ করিলে উহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নূতন নূতন বিষয় শিখিতে পারিবে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কাব্য, নাটক, ভূগোল, খগোল, গণিত, দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞান ও প্রফুল্লতা যুগপৎ লাভ হইবে।

এই পুস্তক অধ্যয়নের দুইটী উপায় আছে, পরিদর্শন ও পরীক্ষা। যে ঘটনা সমক্ষে উপস্থিত হয় প্রথমতঃ অতি সাবধানে তাহার আদি মধ্য শেষ পরিদর্শন কর। ঘটনাটী কোথা হইতে উৎপন্ন এবং কোথায় বিলীন হইল, অবস্থান কালই বা কিরূপ ভাবে গেল, অতি মনোযোগের সহিত দেখ। অনন্তর মনে মনে জিজ্ঞাসা কর, এরূপ কেন হইল? পরীক্ষা করিতে থাক। এক, দুই, দশ দিন গত হউক সদুত্তর প্রাপ্ত না হইলে বিরত হইও না। একদিন সদুত্তর অবশ্যই পাইবে।" ঐ যে অত্যুন্নত পর্ব্বত শ্রেণী ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় আড়াই মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছে, দেখা যায়, তাহার শীর্ষ ভাগ সম্পূর্ণ ধবল বর্ণ। সেই ধবলাং-

বৈর নিম্ন ভাগে নীল ও ধবলের মিলনরেখা। অনুশীলনে বুঝিতে পারিবে, উচ্চ পর্ব্বত মাত্রই কি শীতে কি গ্রীষ্মে ঐরূপ তুষার মণ্ডিত থাকে। নিম্নস্থ সীমা তুষাররেখা। সমুদ্রের সমতা হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চে উঠিলে, ঐ রেখা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থা দৃষ্টে উচ্চ ও নিম্ন স্থানের শীতোষ্ণতার প্রভেদ এবং সেই কারণেই যে পর্ব্বত-শীর্ষে তুষার হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পৃথিবীর বিষুব রেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণাংশে যতই অগ্রসর হইবে, সূর্য্যের তেজ তত মন্দ, শীত তত অধিক। স্থানের উচ্চতা এবং নিম্নতা আর সূর্য্য হইতে দূরত্ব ও নৈকট্য হইতে শীত গ্রীষ্মের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝা যায়। এই সকলের সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ।

অনন্ত বায়ুরাশি পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে। জল-নিমগ্ন সঞ্চরমাণ জলজন্তুর ন্যায় পৃথিবী বায়ু-সাগরে নিমজ্জিত ও ভাসমান আছে। জলের তরঙ্গ বীচিমালায় এবং বায়ুর তরঙ্গ ঝটিকাদিতে প্রকাশ পাইতেছে। জলেরও গতি আছে, বায়ুরও গতি আছে। জল নিম্ন দিকে চলে কিন্তু বায়ু সর্ব্বত্রই-গমন করে। জল ও বায়ুতে সম্বন্ধ অতি নিকট। বায়ু সঙ্কোচনে জল হইতে পারে, আবার জল লঘু করিয়া বাষ্পে বা দুইটী বায়ুতে পরিণত করা যাইতে পারে। এক কলসী জল উঠাইয়া লও, চারি দিকের জল আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিবে। কোন কারণে এক স্থানের বায়ু লঘু হউক, চারিদিক হইতে ঝটিকাবেগে বায়ু আসিয়া সেই অভাব মোচন করিবে। কোন স্থানে বায়ু আর্দ্র বা ঘন হইলে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক বায়ু লঘু করা যাইতে পারে। অগ্নির উত্তাপে জলও বাষ্পে, পরিশেষে বায়ুতেও পরিণত হয়। সমুদ্রের বাষ্প-কণ-বাহী দক্ষিণানিল আমাদের নিকট শীতল বোধ হয়।

বায়ুর বিষয় বিস্তাররূপে আলোচনার পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন। আর্য্য পণ্ডিতগণ সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি জানিতেন একথা প্রকাশ পায়। কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রবিমুখ বলও

তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। অনন্তর গ্রীকগণও এ সম্বন্ধে অস্ফুট ভাবায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ নিউটন একটী আতার বৃক্ষ হইতে পতন পরিদর্শনান্তে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে "এরূপ কেন হইল?" এই প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল, এই জন্য তিনি ঐরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করেন। নিউটনের আবিষ্কার, পরীক্ষা ও পরিদর্শন ফলের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের পর বস্তুর ওজনের কারণ নির্ণয় হইল। উচ্চে ও নিম্নে ওজনের হ্রাস বৃদ্ধির কারণও বুঝা গেল। যে সকল পদার্থের পরমাণু সংহতি ঘনসন্নিবিষ্ট, তাহাদের ওজনও তদনুযায়ী অধিক। অধিক পরমাণুবিশিষ্ট বস্তু অধিক বলে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়া তাহার ওজনও অধিক হয়। জল ও মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকিলে তজ্জন্যই মৃত্তিকা নিম্নভাগে পড়ে, তৈল ও জল একত্র থাকিলে তৈল ভাসিয়া থাকে।

আমরা বায়ু সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে ছিলাম। অনুমান পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ দিকে বায়ু আছে অনুভব করা যায়। যেমন জল অপেক্ষা তৈল লঘু বলিয়া মিশ্রিত হইলে তৈল উপরি ভাগে উঠে; উষ্ণ জলে স্নিগ্ধ জল ঢালিয়া দিলে স্নিগ্ধ জল নীচে পড়ে উষ্ণ জল উপরে উঠে, বায়ুরও তদ্রূপ। উষ্ণ অর্থাৎ লঘু বায়ু উপরে উঠে, অপেক্ষাকৃত আর্দ্র ও ঘন বায়ু নিম্নে থাকে। সুতরাং আমরা যতই ঊর্দ্ধে উঠি, ততই লঘু বায়ু প্রাপ্ত হই। পরিশেষে এমন স্থানে উপস্থিত হইতে পারি, যেখানে নিশ্বাস প্রশ্বাস সুকঠিন। যাহারা বেলুনের সাহায্যে শূন্যে উঠে, তাহারা খাদ্যাদির সম্বলের ন্যায় বায়ুরও সম্বল লইয়া যায়। বায়ু জল অপেক্ষা লঘু, জলের নীচে এজন্য আমরা থাকিতে পারি না। নিশ্বাস রোধ হইয়া আইসে। সেখানে বায়ু নাই, আমাদের শরীরস্থ বায়ু উপরে উঠিতে চায়, সুতরাং আমাদিগকেও ভাসাইয়া উঠায়। বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তন পরিদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বায়ুশূন্য প্রদেশে এক

মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিনা। বায়ু কোন প্রকারে কলুষিত হইলে আমা-দিগকে মারিয়া ফেলে। বায়ু লঘু হইলে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। ঘন হইলে কফ কাশি জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবে সর্ব্বদাই পীড়িত রাখে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব বায়ুর অবস্থা জ্ঞান। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস করি, তাহা আমাদের হৃদয় ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া শোণিত শোধন করে। দূষিত বায়ুরাশি যখন অন্য রূপে সংশোধিত হওয়া কঠিন হয়, লঘু বায়ুতে প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে, তখন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে বৃষ্টি হইয়া বায়ু শোধন করে।

বায়ুর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে 'কেন বৃষ্টি হয়?' 'শূন্যে জলরাশি কোথায় কি অবস্থায় থাকে?' 'পড়িয়া যায় কেন?' 'একত্র না পড়িয়া ফোঁটা ফোঁটা পড়ে কেন?' 'কখন ক্ষুদ্র বিন্দু কখন বৃহৎ বিন্দু দেখা যায় কেন?' 'ফোঁটা গুলি গোলাকার হওয়ার কারণ কি?' 'আমরা যে মেঘ দেখিতে পাই তাহা কি পদার্থ?' 'কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করে?' 'করকা কি?' 'মেঘ গর্জ্জনের কারণ কি?' 'সময়ে সময়ে বজ্রঘাত হইয়া প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইতে, অনেক বস্তু বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত হইতে দেখা যায়, আমরা কার্য্য দেখি কারণ দেখি না। 'সেই বজ্র কি পদার্থ?' এইরূপ শত শত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে, জীবনের প্রথম হইতে সতর্ক হইয়া ইহার প্রত্যেকটী ঘটনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করে এবং অন্যের সাহায্য না লইয়া আপন বুদ্ধি, বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে। শিশির ও তুষার পতিত হয় বলিয়া অনেকের ভ্রম আছে; বাস্তবিক বৃষ্টির ন্যায় পতিত হয় না। কোন বস্তু তাপবিকীরণ করিয়া যখন শীতল হয়, তাহাতে শীতল বায়ু লাগিলেই ঐ বায়ু শীতল হইয়া বিন্দু বিন্দু আকারে পদার্থে লাগিয়া থাকে, তাহাকেই শিশির বলে। আর পর্ব্বতাদিতে তাপ একবারে থাকে না, শীতের আতিশয্য প্রযুক্ত শিশি-

রের ন্যায় যে জলবিন্দু সংযোগ হওয়া সম্ভব ছিল, তাহা একবারে জমিয়া যায় ও তুষার হয়। এ সকল অনুসন্ধান করিয়া জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। একটী শুষ্ক ধাতু পাত্রে বরফ রাখ, তাহার বহির্ভাগ আর্দ্র হইবে; ভিতরের জল চোয়াইয়া ওরূপ করে না, শীতল বায়ু পাত্রে লাগিলে জমিয়া জল হয়।

পরীক্ষা ও পরিদর্শন সাহায্যে বাষ্পের গুণ ও শক্তি অবগত হওয়া গিয়াছে। এই দুইটী অবলম্বন করিয়া ইয়োরোপ, আমেরিকা, চীন প্রভৃতির এত কৌশল, এত প্রাধান্য। গালিলিওর ঘটিকা যন্ত্রের মূলোদ্ভাবন, আর্ক্‌ইটের সূতাকলের সঙ্কেত আবিষ্কার, জ্যোতির্ব্বিদগণের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গতি বিধি নির্ণয় প্রভৃতি যাহাই কেন ভাবিয়া না দেখ পরীক্ষা ও পরিদর্শন ব্যতীত কিছুই হয় নাই।

মহাভারতে লিখিত আছে বীরবর দ্রোণাচার্য্য যখন কুরুপাণ্ডব গণকে অস্ত্র শস্ত্রে দীক্ষা দান করিতেছিলেন, তখন এক দিবস তিনি শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে এক প্রান্তরে উপস্থিত হন। তিনি ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে যে যাহা দেখিতে পাও তৎপ্রতি বাণ নিক্ষেপ কর।' কেহ বৃক্ষমূলে, কেহ বা শাখায়, কেহ বা স্থুল অন্য কোন পদার্থে লক্ষ্য করিল। অর্জ্জুনকে 'কি দেখিতেছ? তোমার লক্ষ্য কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বৃক্ষ পত্রান্তরালে একটী ক্ষুদ্র পক্ষীর মস্তক দেখিয়া তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন এইরূপ বলিলেন। আচার্য্য অর্জ্জুনের ঈদৃশ অভিনিবেশ দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে এ কথা তখন বুঝিতে পারিলেন। অধ্যাপক ছাত্রগণকে সমভাবেই শিক্ষা দান করেন, কিন্তু অভিনিবেশের ন্যূনাতিরেকে ছাত্রে ছাত্রে এত প্রভেদ হয় যে, তাহা বর্ণন করিলে শেষ হয় না। কবিবর কহিলে শেষ হয় না। কবিবর ভবভূতি এই অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রকৌমুদী, মৃত্তিকা ও চন্দ্রকান্ত মণির উপর সমভাবে পতিত হওয়া সত্ত্বেও

যেমন চন্দ্রকান্ত মণি সিক্ত হয় এবং তাহার গুণ বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু মৃত্তিকার কিছুই হয় না, সেই রূপ গুরু, সকল শিষ্যকে সম-ভাবে শিক্ষা দান করা স্থলেও কেহ প্রাজ্ঞ হয়, কেহ বা জড়ই থাকিয় যায়।" এই প্রভেদ কি কেবল মনঃসংযোগ ও অনুশীলনের তারতম্যেই ঘটে না?

অনেকে রাজপথে ভ্রমণ করে, অথচ পথপার্শ্বে কি আছে সে দিকে তাহারা একবারও চাহিয়া দেখে না। কোন এক বাজীকর তাহার পুত্রকে একপ শিক্ষাদান করিয়াছিল যে, সে কোন দোকানের নিকট দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র দোকানের সমুদয় গুলি বস্তু এক দৃষ্টিতে পরিচয় করিয়া লইত। এই ক্ষমতা অনেকে অনুভব করিতে পারিত না; সাধারণে মনে করিত বালকের কোন দৈবশক্তি আছে। কিন্তু সে দৈবশক্তি সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, যে কেহ মনোযোগ সহকারে পরি-দর্শন করে, সেই সেইরূপ দৈবশক্তি লাভ করিতে পারে।

উচ্চ পর্ব্বতের আকর্ষণে মেঘমালা তাহাতে সর্ব্বদাই সংলগ্ন থাকে, সুতরাং অন্যান্য স্থানাপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হয়। সূর্য্যো-ত্তাপে তুষার গলে, বৃষ্টির জলও পর্ব্বতে পড়ে, এই সমস্ত জল প্রস্তর, গৈরিকাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এই রূপ প্রচুর রস প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতের বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি অতিশয় সতেজ হয়, এবং পার্শ্বস্থ সমস্ত নিম্ন ভূমি সিক্ত রাখে। এইরূপে কোন স্থানে দুই একটী উৎস, কোন স্থানে ক্ষুদ্র ঝরণা উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষুদ্র ঝরণা নিম্নদিকে ধাবিত হইয়া বৃহৎ ঝরণা, ক্রমে ক্ষুদ্র নদী, পরিশেষে চারিদিক হইতে অন্যান্য ঝরণা ও উপনদীর জলপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎ নদীতে পরিণত হয়, এবং অনেক দূরে গিয়া সাগর গর্ভে মিলিয়া যায়। পত্রপল্লববিহীন একটী বৃক্ষ যেরূপ দেখা যায়, শত মুখে বিভক্ত সাগর সঙ্গম স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উৎ-পত্তি স্থান পর্য্যন্ত নদীটী নয়নে অঙ্কিত কর ঠিক সেইরূপ দেখাইবে। সাগরসঙ্গমস্থান মূল, যে অংশে নদী অধিক প্রশস্ত সেইটী বৃক্ষের গুড়ি,

শাখানদী, উপনদী প্রভৃতি বৃক্ষশাখা, এবং ঝরণা প্রভৃতি প্রশার্খা। এইরূপ আকৃতি কেন হয়? অধিকাংশ নদীর গতি দক্ষিণাভিমুখে কেন? ওবি, ইনিসি, লিনা, এল্‌ব্‌, ওডার্‌ প্রভৃতি নদী উত্তরাভিমুখে এবং কয়েকটী নদী পশ্চিম মুখে পড়ার কারণ কি? নদীর গতিই বা বক্র হয় কেন? এ সমস্তই জানিবার আবশ্যক। যাহার পরিদর্শন-ক্ষমতা বলবতী, যে কোন বিষয় পরীক্ষা না করিয়া ছাড়ে না, তাহার পুস্তক বা উপদেশ সাহায্য অনাবশ্যক, আপনা হইতেই এ সকল শিখিতে ও জানিতে পারে।

নদীর জল বালুকা ও কর্দ্দমে মিলিত থাকে, কিন্তু কোন মাঠে জল স্থির ভাবে দাঁড়াইলে তাহা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখা যায়। নদীর তীরবর্ত্তী স্থান দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উচ্চ। অনুসন্ধান কর, এ সকল কার্য্যেরই কারণ আছে; একটী পাত্র স্রোতস্বতী নদীর জলে পূর্ণ করিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দেও। একদিন পরেই দেখিতে পাইবে কিছু কমি-য়াছে, অবশিষ্ট জল পরিষ্কার হইয়াছে,, কিন্তু ভিতরে ঘনীভূত পদার্থ জমিয়া আছে। ঐ স্তরের ন্যায় পদার্থ কর্দ্দম ও বালুকা; যাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল আবিল করিয়াছিল তাহাই স্থির থাকা প্রযুক্ত এবং জল হইতে ওজন অধিক এজন্য নিম্নভাগে পতিত হইয়াছে। এই উত্তর প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে আপনাকে আপনিই জিজ্ঞাসা কর, কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল? দেখিতেছ আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে, সে জল অতিশয় পরিষ্কার, কিন্তু তোমার বালুকাময় আঙ্গিনায় পতিত হইলে সে জলও ঘোলা দেখায়, আবার দুর্ব্বার উপর জল পড়িলে পরিষ্কার থাকে। অধিক বৃষ্টির পর দেখা যায়, তোমার বালুকাময় অঙ্গনের অনেক স্থানের মৃত্তিকা কাটিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থান মাত্র ধৌত হই-য়াছে। তখন ঐ ধৌত মৃত্তিকা যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাদৃশ অপরিষ্কার হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিল না। পরি-দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নদীরও সেই অবস্থা দেখিতে পাইবে। নদীর

তীরভূমি স্রোত ও তরঙ্গে অনবরত ভাঙ্গিতেছে। স্রোতবলে গর্ভস্থ মৃত্তিকা কাটিতেছে, ঐ সমস্ত জলের সহিত মিলিত হয়, এজন্য জল অপরিষ্কার। নদীর তীরভূমি জলের সমীপস্থ, তাহাতে ছোট ছোট চারা গাছ জন্মে। তীর যখন ডুবিয়া যায় ঐ সকল তরু গুল্মাদির মধ্য দিয়া স্রোত অপ্রতিহত ভাবে যাইতে পারে না। সুতরাং জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে বস্ত্রের উপরিভাগে যেমন কর্দ্দমাদি থাকে, নিম্নভাগে পরিষ্কার জল পড়ে, ঐ সকল কর্দ্দম ও জলের অবরোধ প্রযুক্ত তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল মাঠে গিয়া দাঁড়ায়। ঐ কর্দ্দম বৎসর বৎসর স্তরে স্তরে পতিত হয় সুতরাং তীরদেশ উচ্চ হইয়া উঠে। নদী গর্ভস্থ চড়া স্থান গুলিতে ঝাউ প্রভৃতি জন্মে এবং তজ্জন্যই সেই সমস্ত সহজে উচ্চ হয়।

- এই সকল কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আরও কয়েকটী প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে। ধৌত মৃত্তিকা কোথায় যায়? শত শত নদী সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্র শুষ্ক হয় না কেন? স্রোতস্বতী নদীতে চড়া বাঁধে কেন? যে স্থান হইতে শাখা নদী বাহির হয় সেই স্থান এবং যে স্থানে উপনদী মূল নদীতে মিলিত হয় সেই মিলন স্থান অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অগ্রে শুকাইবার কারণ কি? বড় নদী গুলির সমস্ত স্থানে জল অতিশয় বেগে পতিত হয়, সুতরাং সেই অংশ অতিশয় গম্ভীর থাকা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কয়েক বৎসর গত হইলে সেই স্থানে দ্বীপ দেখা যায় কেন? যে স্থানে জলের ভীষণ আবর্ত্ত থাকে, সেই ভাগ দুই এক বৎসর অন্তে শুকাইবার কারণ কি? যে সাবধানে পরিদর্শন করে তাহার নিকট ইহার একটী প্রশ্নও কঠিন নহে। এক স্থানের মৃত্তিকা ধৌত হইতেছে, তাহাই আবার অন্য স্থানে যাইয়া দ্বীপ অথবা চড়া উৎপাদন করিতেছে। এক নদীর মৃত্তিকা অন্য নদীতে পতিত হয়, সে নদীর স্রোত অল্প থাকিলে নদী তাহাতে অল্পদিনেই শুকাইয়া যায়। এই জনাই অধিকাংশ শাখা নদী স্থায়ী হয় না, সতত তাহাতে

নৌকাও চলে না। সমুদ্রে যে মৃত্তিকা পতিত হয় তাহার সমস্ত সমুদ্রে থাকে না। কিয়দংশ উপকূল ভাগ উচ্চ করে, কতক মৃত্তিকায় দ্বীপাদি গঠিত হয়, কতক আবার জোয়ারে নদী গর্ভে পুনরায় প্রবেশ করে। তথাপি নদী ধৌত মৃত্তিকার কার্য্য নিতান্ত সামান্য নহে। এক সময় ভারতবংসাগর শিকিম, ভুটান, ও কামরূপ প্রদেশের সমীপস্থ হিমাচলের পাদদেশ প্রক্ষালন করিত, মধ্যবর্ত্তী বঙ্গদেশ ছিল না। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রাদি বিধৌত মৃত্তিকায় বঙ্গদেশের সৃষ্টি। প্রাচীন বঙ্গদেশ অতি ক্ষুদ্র ছিল,—উড়িষ্যার উত্তর পূর্ব্বাংশে অতি ক্ষুদ্র প্রদেশটী বঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। সুন্দরবন ক্রমেই দক্ষিণে সরিতেছে ক্রমেই বঙ্গদেশের আয়তন বাড়িতেছে।

যখন কোন স্থানে অতিশয় বেগে জল পড়ে, সে স্থান গম্ভীর হয়। তখন সেখানে আবর্ত্ত পড়ে। জল কমিয়া গেলে স্রোত ও আবর্ত্তের বেগ কমে, তখন তাহার নিম্নভাগের মৃত্তিকা অনায়াসে জমাট হইতে পারে। বৃক্ষ নৌকাদি যাহা পড়ে তাহাই থাকে, তদুপরি মৃত্তিকা অনায়াসে জমিয়া যায়। এইরূপে আবর্ত্ত, নদীর মুখ, সঙ্গমস্থান সকলই শুষ্ক হইতে পারে। ব্রহ্মপুত্র হইতে ঝিনাই ও দাওকোবা বাহির হইয়া জগন্নাথগঞ্জের উত্তরে মিলিত হইয়াছে। ঐ মিলন স্থানে যমুনার উৎপত্তি। দশবৎসর পূর্ব্বে সেই স্থান ভীষণ ছিল, সহসা কেহ নৌকা চালাইতে সাহস পাইত না। এক্ষণে ঐ স্থানে চড়া বাঁধিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় বেগ, গভীরতা, তরঙ্গ গর্জ্জন কিছুই নাই। কম্পাপুরের নিকট ঝিনাইর মুখও শুকাইয়া যায়। যে সকল স্থানে প্রস্তরের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত, তটাভিঘাতে কোন অপচয় হয় না, কেবল সেই স্থানে গতি স্থির থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের ন্যায় বালুকাময় প্রদেশে নদীর গতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রকৃতির ধাত্রীর ন্যায়,—প্রকৃতির বেশ বিন্যাস ও সুখ সাধনে সর্ব্বদা নিবিষ্ট। নিদাঘে যখন সূর্য্যের দারুণ উত্তাপে

বসুধা প্রতপ্ত হয়, শোকার্ত্তের উষ্ণ নিশ্বাসের ন্যায় উষ্ণ বাষ্প পৃথিবী হইতে উঠিয়া থাকে, বায়ুরাশি নিতান্ত লঘু হইয়া যায়, প্রাণিগণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তৃষ্ণার্ত্তা প্রকৃতির বারি ও ব্যজনের প্রযোজন, তখন ঝড় বৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞচক্ষু বিনা উপদেশে অনায়াসে এসমস্ত বুঝিতে ও জানিতে পারে। আমাদের দেশীয় অশিক্ষিত নাবিকগণ কেবল পরিদর্শন ক্ষমতা বলে বায়ুর গতি ও অবস্থা, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বেই এরূপ বুঝিতে ও বলিতে পারে যে, পণ্ডিতগণ বায়ুমানযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াও অনেক সময় সেরূপ পারেন না।

যে সকল যন্ত্র আবিষ্কার হইয়া লোকের কার্য্য সাধন পক্ষে এত সুবিধা হইয়াছে, সে সমস্তই পরীক্ষা ও পরিদর্শনের ফল। সামান্য ঘটনা সকল প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির নয়ন সমক্ষে ঘটিতেছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাহা হইতে ঐ সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। রেইলের গাড়ী, বাষ্পীয় যান, সুতাকল, তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রভৃতি সমস্তই পরীক্ষা ও পরিদর্শনের ফল। তারে যেমন সংবাদ দেওয়া যাইত, সম্প্রতি প্রায় সেই প্রণালীতে দূরদেশস্থ ব্যক্তিদ্বয় মধ্যে আলাপের সুবিধার্থ টেলিফোন নামে আর একটী যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এক ব্যক্তি দূরবর্ত্তী স্থানস্থ অন্য এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে আর একটী যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। মৃত্তিকা খননের কল, সীবন-যন্ত্র, ঘটিকা যন্ত্র, কর্ত্তন যন্ত্র, জলের কল, বেলুন ইত্যাদি যে সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে সকলই ঐ দুইটী গুণের সাহায্যে। পারদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাপমানের সৃষ্টি, তাপমানেই আবার মনুষ্য শরীরের শীতোষ্ণতা নিরূপণ হয়। চক্র, স্ক্রু, দণ্ড, কপি প্রভৃতি যে সাতটী বলের সাহায্যে আমরা দিবা নিশি সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, সে সকলই কি যন্ত্র পরিচালনের অথবা যন্ত্র বিজ্ঞানের মূল নয়? কিন্তু ঐ সকল বল পরীক্ষা ও পরিদর্শন দ্বারা শিক্ষা হয়। আবশ্যকীয় কার্য্যে বুদ্ধির পরিচালনা যদি মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে যন্ত্রাদি আবিষ্কার

করিতে যত্ন করা অতিশয় প্রশংসনীয় পথ সংশয় নাই। স্বাধীন তর্কে অন্যের মুখপ্রেক্ষী না হইয়া নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলে মনের সুখ, যশ, অর্থ সকলই লাভ হইতে পারে। প্রকৃতি অকপট হৃদয়ে সর্ব্বথা সকল বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, অভ্রান্ত উপদেষ্ট্রীর ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য প্রণালী দেখাইতেছেন, যাহার শিখিতে বা জানিতে বাসনা, নয়ন উন্মীলন করিলেই তাহার সে ইচ্ছা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। অনন্তকাল পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিলেও সমাপ্ত হয় না; এক উদ্ভিজ্জ বিদ্যার অনুশীলনে অযুতজীবন অতিবাহিত হইতে পারে, প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা করিতে সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া যাইতে পারে, ভূগোলাদি প্রত্যেক বিষয় মনুষ্যের পক্ষে অনন্ত। অনন্ত পরিশ্রমের লাঘব জন্য যন্ত্রাদির আবশ্যক, প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সহজে অল্প সময়ে সম্পাদনার্থ কল সমূহের প্রয়োজন। অল্পে অনেক সাধন করিতে কৌশল লাগে। অতএব সেই কৌশলের প্রতি সকলেরই মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নিসর্গগ্রন্থে সকলই রহিয়াছে। প্রকৃতির রণ-রঙ্গিনী অথবা মনোহারিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয় কাব্য সুধাপান করিবে, এবং মনুষ্যের মনের অবস্থা কার্য্যতায় দর্শনে মনোবিজ্ঞান-রসাস্বাদন হইবে। মনুষ্য মাত্রেই কবি, দার্শনিক, গণিতবিৎ, সকলেরই অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ক্ষমতা আছে। যেমন কোন শাণিত অস্ত্র অনাদরে রাখিয়া দিলে মালিন্য প্রযুক্ত তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, মনুষ্যের মানসিক শক্তিও তদ্রূপ। কিছু দিন অলস ভাবে বসিয়া থাক, কার্য্য পটুতা ও কার্য্যক্ষমতা কূর্ম্মের মস্তকবৎ আপনাতে লুকাইত রাখ, তোমার মনোবৃত্তি এমনই দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইবে যে, তোমার চিন্তাশক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, সামান্য একটী বিষয় অনুশীলন করিতেও অন্তঃকরণ শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িবে। যাঁহারা বিদ্যালোচনায় জীবন যাপন করেন, তাঁহারা যদি কয়েক বৎসর মাত্র ললিত কাব্য, উপন্যাস, নাটকাদি অধ্য-

থবে অথবা নিতান্ত সামান্য প্রানবাছেও রত থাকেন, তাহা হইলে গণিত কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন-ক্ষমতা তাঁহাদের আর থাকিবে না। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মধ্যে কাহারও সাহিত্যে বুদ্ধি, কাহারও গণিতে, কাহারও ভূগোল ইতিহাসে, কাহারও বা অন্য বিষয়ে বুদ্ধি আছে এইরূপ একটী ভ্রান্ত মত দীর্ঘকাল হয় চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি সকল বিষয়ে সমভাবে ধাবিত হইতে পারে। যখন যে বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ হয়, তখন সেই বিষয়ে অধিক উপযোগিতা দেখা যায়, এই মাত্র। এক বিষয় অনুশীলনে দীর্ঘকাল সময় কর্ত্তনান্তে উন্মনস্ক ভাবে অন্য বিষয়ে মন কেন প্রবেশ করিবে? অলসতা প্রযুক্ত যে বিষয়টী উপেক্ষিত হয়, শেষে আর সে বিষয় চিন্তা করার শক্তি থাকে না। যে উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করে, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর দ্বিতীয় নাই। দোষ ঈশ্বরেরও নহে, শিক্ষকেরও নহে, মাত্র নিজের দোষ।

একটী প্রাণীর শরীর পরীক্ষা কর, কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবে। হস্ত পদাদির স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন, অঙ্গুলিগুলির যথোপযুক্ত সন্নিবেশ, ইন্দ্রিয় সকলের আশ্চর্য্য কার্য্য, চক্ষু কর্ণাদির গঠন, শোণিত সঞ্চালনাদি, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, অনন্ত কৌশল দেখিতে পাইবে। যে পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধি বিচার করিতে ক্ষমবান্, সে পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়েই আত্মজিজ্ঞাসু হও, সন্দেহ নিরসনার্থ শত বার জিজ্ঞাসা কর; তোমার মন সদুত্তর বলিয়া দিবে। অনুসন্ধিৎসু মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির মন অনন্ত চিত্রপট, যাহা কিছু অঙ্কিত করিয়া রাখিতে চাও, তাহারই স্থান হইবে। মনুষ্য-সাধ্য নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। ফরাশি ও জর্ম্মণজাতি মধ্যে সে দিন যে ভীম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহাতে ফরাশির রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী বিলোপ হইয়াছে এবং আলসস্ ও লরেইন প্রদেশ পুনরায় রাইনিস্ প্রুসিয়ায় মিলিত হইয়া গিয়াছে, সেই ভীষণ যুদ্ধের পূর্ব্বে কে যুদ্ধ বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক কৌশলের তাদৃশী পরা-

কাঠা সন্দর্শন করিয়াছিল ? কপোতের দৌত্য, বেলুনে সংগ্রাম প্রভৃতি কেইবা ভাবিযাছিল ? বিজ্ঞানের নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নাই। দুর্ব্বল মানবকে সবল করিতে বিজ্ঞান শাস্ত্র ঐশশক্তি।

কারণ ও কার্য্য এই দুইটী জগতে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। কারণ দেখিলে কার্য্য অনুমান করা যায, কার্য্য থাকিলে কারণ আছে। এই শব্দ দুইটীর ব্যবহারে বৈজ্ঞানিকগণমধ্যেও অনেকে সতর্ক হন নাই, গোলযোগ করিযাছেন। অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলকে কেহ কার্য্য, কেহ কারণ বলিয়াছেন। কোন পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিযা পর্ব্বত বহ্নিমান মনে করিতে পারি। এইস্থলে ধূম, বহ্নি অনুমানের কারণ, আর কেহ বহ্নির কার্য্য বলিযাছেন। আমরা সর্ব্বদাই, দেখিতে পাই, অগ্নির সঙ্গে ধূম আছে, প্রজ্বলিত অবস্থায অল্প, নির্ব্বাপিত অবস্থায অধিক দেখা যায়। কিন্তু ধূম ব্যতীত অগ্নি অথবা কোন আগ্নেয় বা তেজোময পদার্থ ব্যতীত ধূম থাকিতে পারে না। অগ্নি ও ধূমে অভেদ সম্বন্ধ। সুতরাং ধূম নির্গমকার্য্য দেখিযা, অনেকে অগ্নি তাহার কারণ বলিযা নির্দ্দেশ করিযাছেন। আবার অগ্নি জ্বালান কার্য্য হইতে ধূমের উৎপত্তি হয দেখিযাই ধূমই কারণ একথাও কেহ কেহ বলিযাছেন। সুতরাং এই দুইটী শব্দ ব্যবহারে ভ্রমে পতিত হওযা আশ্চর্য্য নয। আমরা বোধসুগমার্থে ঘটনাটীকে কারণ এবং তাহার ফলকে কার্য্য বলিব। যেমন পারদ ও গন্ধক মিশ্রিত করিলে হিঙ্গুল উৎপন্ন হয। এস্থলে পারা ও গন্ধকের মিশ্রণ কারণ হইতে হিঙ্গুল উৎপন্ন কার্য্য হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে; সেই ঘটনাটী ও তাহার ফল অর্থাৎ কারণ 'কি' এবং 'কেন' শব্দে প্রকাশ করিতে এই নামে প্রবন্ধটী হইয়াছে। কেবল ঐ দুইটী শব্দ হইলেই হয না, তাহার সহায আবশ্যক। দূরবীক্ষণ হস্তে লইযা সূর্য্যের চারি পার্শ্বস্থ গ্রহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। দেখিতেছ অনেক গুলিন চারি ধারে বেষ্টন

কাঁদিয়া আছে। একটী কল্পিত রেখা দ্বারা কয়েকটী গ্রহ সংযোগ করিয়া দেখা গেল প্রায় বৃত্তাকার একটী পথ হইল। কিন্তু কিছু দীর্ঘছন্দ,— হংসের ডিম্বের ন্যায়। তখন তোমার ধারণা হইল, "যে কক্ষে গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা ঐরূপ অণ্ডাকার হইবে। অন্নপাক হইতেছে, একটী অন্ন উঠাইয়া লইয়াছ। দেখিতেছ সেইটি সুসিদ্ধ হইয়াছে। তখন তোমার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল যখন পাত্রস্থ সমস্ত তণ্ডুল এক ভাবে অগ্নির উত্তাপ পাইয়াছে, সমস্তই পক্ক হইয়াছে সংশয় নাই। এইরূপে আমরা একটী কারণ দেখিলে তাহার সমধর্ম্মাক্রান্ত অন্যকারণ হইতেও তাহার তাদৃশ কার্য্য হইবে এটী অনুমান করিয়া লই। এই সাদৃশ্য জ্ঞান ও তুলনা-ক্ষমতায় আমাদের পরিদর্শন ও পরীক্ষার বিস্তর সহায়তা করে।

আমরা যদি কার্য্য দেখিয়া মানব মনের কারণ এবং কারণ বুঝিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত কার্য্য গুলি পরীক্ষা করি, তবেও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। যে ব্যক্তি কথায় কিছু ব্যক্ত করিবে না, অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহার চক্ষু মাত্র দেখিয়া মনের তৎসময়ের সমস্ত ভাব অনুমান করিয়া লই। যখন নয়ন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রফুল্ল দেখি, মনও তদ্রূপ আছে বুঝিতে পারি। মনের মালিন্য ও বিষাদ নিষ্প্রভ দীননয়নই প্রকাশ করে। আরক্তনয়ন ক্রোধের চিহ্ন। দৃষ্টি যখন কোন বিষয়ে স্থির থাকে না, অনিশ্চয় ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়, ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়, তখন বাতুলতা অনুমান করি। আবার বিকৃতবদন, সঙ্কুচিত ললাট, উন্নত স্কন্ধ, কুঞ্চিত অঙ্গুলি প্রভৃতি মানসিক ভীতিদ্যোতক। কুটিল ভ্রূযুগলও মুখশ্রীর অযথা ভঙ্গী ঘৃণাবিজ্ঞাপক। হস্তদ্বয় অবসন্ন, বদন শ্রীহীন ও দীননয়ন দৃষ্টে হতাশার দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা অনুভব করি। আরক্ত কপোল, অবনত বদন লজ্জার ভাব প্রকাশ করে। এই রূপ নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তির অন্তঃকরণের নিগূঢ়তম ভাব ও অনেক সময়ে বাহ্যাকৃতি দৃষ্টে

অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের মনের গতি অনুসারে কোন্ সময়ে কেমন অবস্থায় বসিয়া থাকি তাহা স্মরণ করিয়াও অনেক বুঝিতে পারি।" আর সমস্ত পরীক্ষা ও পরিদর্শনের ফল।

বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীগণ বুদ্ধি দ্বারা অনুমান করিতে পারেন, সংসার যে ভাবে চলিতেছে, ঠিক এই ভাবে চলিলে দশ বৎসর পরে এইরূপ ফল দাঁড়াইবে। তাঁহারা ইতিহাস সাহায্যে এবং স্মৃতির সহায়তায় অতীত ঘটনাবলী হইতে কিরূপ কারণে কিরূপ কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে তদ্বিষয়ে একটী সাধারণ সংস্কার বাঁধিয়া লন। পরিশেষে তুলনা ও সাদৃশ্য জ্ঞানসাহায্যে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ একদা ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতেছিলেন, কতকাংশ লালবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি? একজন পারিষদ বুঝাইয়া দিল, রক্তবর্ণে রঞ্জিত স্থান সকল ইংরেজের অধিকারভুক্ত। তখন তিনি বলিয়াছিলেন "একদিন সমস্তই লাল হইবে।" তিনি লিখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু অতিশয় দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইংরেজের নীতি কৌশল, সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কালে তাঁহার অবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে। যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, এক বার তাঁহাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। তাঁহাদের পরিদর্শন ক্ষমতা কেমন বলবতী! চিত্রকর এক বার মাত্র একটী বস্তু দেখিয়া লয়, ইচ্ছা হইলে পেন্সিল্ দ্বারা একটি চিহ্ন রাখে। কিন্তু দৃষ্ট বস্তুটির প্রতিমূর্ত্তি দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় হৃদয়ে অবিকল ভাবে অতি বিশদরূপে আঁকিয়া রাখে। দুই বৎসর পরে স্থানান্তরে বসিয়া চিত্রটি সম্পাদন করিলেও মিলাইয়া দেখ ঠিক একরূপ হইয়াছে। সঙ্গীতের মধুরতা ও তানলয় জ্ঞান, স্থপতিকার্য্য, সীবনাদি শিল্প, কবির কাব্য রচনাদি, যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পরিদর্শন ও পরীক্ষার ফল পরিগ্রহ হইবে।

আমরা অনেক সময় অনেকরূপ কল্পনা করি। কল্পনায় অস্বাভাবিক সংযোগ ও সমাবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপাদান কখনই প্রকৃতি বহির্ভূত হয় না। নিদ্রিতাবস্থায় জ্ঞানের অগোচরে যে কল্পনা উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করে, তাহাতেও প্রকৃতিতে নাই এমন কিছুই দেখা যায় না। কল্পনা যত কেন প্রমত্ত না হউক, তাহার মূল আছে। আমরা ভূত প্রেতের ভীষণ আকৃতি মনোমধ্যে চিত্রিত করিতে পারি। তাহার আকার যত কেন ভয়ঙ্কর না হউক, হস্ত পদাদির গঠন এবং জীবের ন্যায় কার্য্যক্ষমতা আরোপ করাতে স্বভাবেরই অনুকরণ মাত্র হয়। আমরা কল্পনা-বলে আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইতে পারি, কিন্তু তাহা পক্ষীর মত, সপ্তস্বর্গের উপরে অথবা ধ্রুব নক্ষত্রের অপর পার্শ্বে যাইতে পারি, কিন্তু ঐ সকল স্থান পৃথিবীর সুখ সেব্য স্থানবৎ। আর একরূপ কল্পনা আছে, তাহাতে পূর্ব্বে যাহা দেখা গিয়াছে তাহাই মনোমধ্যে অঙ্কিত করা যায়। আগরার ভুবনবিখ্যাত তাজমহল, এলাহাবাদের সুরম্য সেতু, ইলোরার ভূগর্ভস্থ মন্দিরের দেবমূর্ত্তি গুলি, কলিকাতার কোর্ট উইলিয়ম, ইডেন উদ্যান বা পশ্বালয়স্থ পশুগুলির চিত্র মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। আবার অনেকের এরূপ ঘটে, শত বার যাহা দেখিয়াছে অতি মনোযোগের সহিত ধ্যান করিয়াও সেই বস্তুটী মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারে না, অনেক চেষ্টায় দূরস্থ প্রিয় জনের আকৃতি ছায়ার ন্যায় মানস নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করিলেও পরক্ষণেই যেন সেই মূর্ত্তি বায়ু মধ্যে লীন হয়। কল্পনার এই প্রার্থক্য কেবল পরিদর্শন ক্ষমতার ন্যূনাতিরেকেই ঘটিয়া থাকে। যে বস্তুর আকৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে হইবে, তিল তিল করিয়া সেইটী পরিদর্শন কর, সাক্ষাতেই নয়ন মুদিয়া ধ্যাননেত্রে নিরীক্ষণ কর, যথার্থ হইল কি না তখনই মিলাইয়া দেখ, বারবার এইরূপ করিলে অবশ্য দূর হইতেও সেই আকৃতি মানস নয়নে দেখিতে পারিবে। এইরূপ অভ্যাস হইলে পরিশেষে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য

তত পরিশ্রমের আবশ্যক হইবে না, দৃষ্টি মাত্র আকৃতি স্মরণ থাকিবে। এই বিষয় শিক্ষা করিতেও "কি" এবং "কেন" প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন।

কথিত আছে কোন এক জন গণিতশাস্ত্রবিৎ গ্রীশদেশীয় পণ্ডিত, তাঁহার এক কাব্যামোদী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি সর্ব্বদাই হোমাররচিত কাব্যের প্রশংসা কর; কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই, শেষে তাহা হইতে কি প্রমাণ বা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও?" তিনি বলিলেন, "গণিত শাস্ত্রে যেরূপ 'কি' ও 'কেন' আছে, কাব্যশাস্ত্রেও তদ্রূপ; গণিতে যেমন অব্যর্থ সত্য উদ্ভাবন করে, কাব্যের দৃষ্টান্ত এবং নীতির উপদেশও সেই প্রকার। কাব্যশাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে জাতীয় অদৃষ্ট অঙ্কিত।" যে শিক্ষা লাভ করিবে, সে সকল স্থলেই তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সে আর্কিমিদিসের রণ-কৌশল ও যন্ত্র সকলই পরীক্ষা করুক, অথবা হেলেনের রূপানলে ভস্মীভূত ট্রয় নগর ও হেক্টরাদি বীরগণের পরিণামই তাহার অনুশীলনের বিষয় হউক, সর্ব্বত্রই তাহার অনুসন্ধিত 'কি' এবং 'কেন' প্রশ্নের উত্তর পাইবে। অভ্যুত্থানের পর শোচনীয় পতনের দৃষ্টান্ত স্থান নশানন, আত্মকলহের বিষময় ফলের উদাহরণ কুরুপাণ্ডবগণ, গর্ব্ব ও দুরাশার পরিণাম স্বরূপ শিশুপাল, সকলে আসিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দান করিবে।

ভূগর্ভ খনন কর, সাবধানতার সহিত নিরীক্ষণ করিলে সেই অন্ধ-তমসাবৃত অপরিজ্ঞাত স্থানেও তোমার প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই প্রাপ্ত হইবে। এক স্থানে দেখ, এক খণ্ড প্রস্তর, কাচ বা কয়লা দীপ্তি পাইতেছে; অন্য দিকে কদর্য্য, কৃষ্ণবর্ণ কঠিন বস্তু একটী মৃত্তিকার সহিত মিলিত রহিয়াছে। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানিতে পাইলে, একের গৌরব পূর্ণ নাম—হীরক; অপরটির অনাদৃত নাম,—লৌহ। এখন একবার কেন প্রশ্ন মীমাংসা কর। হীরক কয়লাবার, তদ্দ্বারা কাচ কাটা ব্যতীত কার্য্য হয় না, তাহার স্থান সম্রাট-শীর্ষে;

মূল্যাঁকত গণনা করা সুকঠিন। আর লৌহ আমাদের সকল কর্ম্মের সঙ্গী;—সামান্য কার্য্য বল, বৃহৎ কার্য্য বল, আমাদের জীবন-ধারণে যাহা কিছু প্রয়োজন সে সমস্তেই লৌহ প্রধান সাধন। অথচ লৌহ নিতান্ত অনাদৃত। এরূপ কেন হইল? হীরক সুন্দর, দুষ্প্রাপ্য এজন্য মূল্য অধিক; হীরকের ব্যবহার অল্প এজন্য অর্থ-মূল্য এরূপ উচ্চ। যাহা সকলের ব্যবহার্য্য, না হইলে চলে না, তাহার অগ্নিমূল্য হইলে সাধারণে কোথায় পাইবে? সাধারণের যাহাতে প্রয়োজন নাই, তাহার মূল্য যত ইচ্ছা হউক, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। রাজার অনেক ধন আছে, তিনি ঐ অনাবশ্যকীয় বস্তু ক্রয় করুন; যে অর্থ তাঁহার ধনাগারে অনর্থক বদ্ধ ছিল, তাহা দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে; রাজার মান গৌরব অধিক, হীরক যদি মূল্যবান না হয়, আর সকলেই ক্রয় করিতে পারে, তবে তাঁহার সে গৌরব কোথায় থাকিল? অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই বা কোথায় সফল হইল? ঈশ্বর দয়াবান, সতর্ক সর্ব্বদর্শী। তিনি বিবেচনা করিয়া সংসারে আবশ্যকীয় বস্তু অধিক দিয়াছেন। যাহার প্রয়োজন অল্প একপ বস্তু অল্প পরিমাণেই সৃজন করিয়াছেন। মণি, মুক্তা, স্বর্ণাদি মূল্যবান বস্তুও তজ্জন্যই দুর্ল্লভ। যাহাতে দরিদ্রের প্রয়োজন নাই, তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইলে সমাজের হিত ভিন্ন অহিত হয় না

মনুষ্য অনেক দেখিতে ও করিতে পারে, শিক্ষার্থীর বিষয়াভাব নাই। এক জন্তু অন্য জন্তুর সহযোগে নূতন প্রাণী উৎপাদন করিবে। এক জীব অন্য জীব কর্তৃক প্রতিপালিত হইলে অনেকাংশে প্রতিপালকের ন্যায় হইবে। মনুষ্য অনায়াসে এসমস্ত পরীক্ষা করিতে পারে। কোন একটী বালিকা বন্য জন্তু কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। সে পশুর ন্যায় হস্তে ও পদে ভর দিয়া বিচরণ করিত, মধ্যে মধ্যে পশুর দৃষ্টান্তানুসারে সমীপস্থ সমুদ্র মধ্যে সন্তরণ করিয়া মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ

করিত। একদা জাহাজ হইতে এক সাহেব তাহাকে কোন নূতন জন্তু মনে করিয়া যথার্থ গুলি নিক্ষেপ করেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা তাহার শরীরে লাগিল না। সাহেব অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি সঞ্চালনে বুঝিতে পারিলেন, সেটি জলজন্তু নয়। জাহাজ নিকটে রাখিয়া অনেক চেষ্টায় তাহাকে ধৃত করিলেন। দেখিলেন, পশু-স্বভাব প্রাপ্ত একটী বালিকা। সাহেব তাহাকে যত্ন করিয়া মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শেষে সে দুই পায় ভর দিয়া হাঁটিত, কথা বলিত, অনেকাংশে সে সভ্যের ন্যায় ব্যবহার করিত। কিন্তু ক্ষুধা পাইলে অথবা কোন কারণে বিরক্ত হইলে পশুবৎ ক্রোধ করিত। তাহার শরীরের তেজ ও বল, বন্য পশুর ন্যায়ই ছিল। অনেক বৎসর গত হইলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি মনে হয়?" বালিকা বলিল এখনও আমার মধ্যে মধ্যে এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, তোমাদিগকে মারিয়া আহার করি। এই কৌতূহলজনক বিষয়টির ন্যায় শত শত বিষয় মনুষ্যের অনুসন্ধানার্থ রহিয়াছে।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে "কি" এবং "কেন" বড় গুরুতর প্রশ্ন। যদি এরূপ কল্পনা করা যায় যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নেও ঐ দুইটী প্রশ্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাবিয়া দেখে নাই, অথবা কার্য্যতায়ও তাদৃশ ভাব প্রকাশ পায় নাই, তবে সে ব্যক্তি এবং পশু এতদুভয়ে প্রভেদ কি, এই প্রথম মীমাংসার বিষয় হয়। ফলতঃ ঐ দুইটী প্রশ্ন মীমাংসায় জীবন যাপন মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। "কেন" প্রশ্ন যখন শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হয়, যখন প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি কিছুতেই মীমাংসা হয় না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হয়। "সূর্য্য উদয় হয় কেন?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাওয়া গেল, উদ্ভিদ ও প্রাণীগণের সৃষ্টি ও স্থিতির সাহায্যার্থে আলোকদানে, অন্ধকার দূর করণে সূর্য্য উদয় হয়। এ সমস্তের প্রয়োজন কি? ইহার শেষ উত্তর হইল "নতুবা সৃষ্টি থাকে না।" সৃষ্টিইবা কেন হইল? এই

প্রশ্নের উত্তর প্রদান মনুষ্যের অসাধ্য। সেই "নিষ্প্রভেহস্মিন নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে" (যখন পৃথিবী নিষ্প্রভ ও নিরালোক ছিল, চারিদিক অন্ধকারে আবৃত ছিল) অবস্থা হইতে এই অনন্ত জগৎ কেন সৃষ্টি হইল এ উত্তর কে দিবে? ইহার এক মাত্র উত্তর ঈশ্বরেচ্ছা। তিনি কেন ইচ্ছা করেন, তাহা কেহ জানে না। কেন প্রশ্ন অনন্তকাল হইতে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে, অনন্তকাল জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার শেষ স মা অনন্ত পরমেশ্বর।

মনুষ্যের অস্তিত্ব এই দুইটী প্রশ্নের সহিত এরূপ ভাবে মিলিত যে, প্রভেদ করা যায় না। ইহার একটী না থাকিলেই তাহার অসুখের সীমা থাকে না। যদি এরূপ অনন্তজ্ঞান মনুষ্য কল্পনা করা যায় যে, তাহার 'কি' বা 'কেন' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় না; তথাপি তাহাকে সুখী বলা কঠিন হয়। কারণ সে জ্ঞানোপার্জ্জনের কষ্ট জানে না, এ প্রযুক্ত জ্ঞানের সুখে বঞ্চিত। হৃদয় খুলিয়া তাহার স্তরে স্তরে অনুসন্ধান কর, চীন হইতে পিরু পর্য্যন্ত, কেন্দ্র হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, সর্ব্বত্রই কারণ এবং কার্য্য বন্ধন, সুতরাং 'কি' এবং 'কেন' দেখিতে পাইবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের ক্রীড়া নিকেতন ফ্রান্স্, ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ইয়ুনাইটেড্ষ্টেট্, চীনদেশ অথবা প্রাচীন ভারতবর্ষ, গ্রীশ, মিশর, আরবের বিবরণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন কর ঐ দুইটী প্রশ্নের মীমাংসায় কি পর্য্যন্ত সংসাধিত হইয়াছে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

যদি কাহারও আত্মোন্নতি-সাধন বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সে যেন প্রথম এই প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমি কি? কেন এসংসারে আসিয়াছি? কোন্ দৌত্য কার্য্য সংসাধন করিতে হইবে?" সে যদি অবনত হইয়া থাকে, তবে তাহার জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, "কি ছিলাম, কি হইলাম? কেন এরূপ হইলাম?" যদি সে সমস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক সুখ লাভ প্রত্যাশা করে, তাহার জিজ্ঞাস্য "কি উপায় অবলম্বন করিব?

কোন পথ অনুসরণ করিলে বিঘ্ন বিপত্তি বিদূরিত হইবে? এই দুর্বিসহ যন্ত্রণা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব?"

প্রকৃতির ভ্রান্তি নাই। নৈসর্গিক সমস্ত সত্য বিশুদ্ধ ও বিমল। প্রকৃতি-গ্রন্থ সমক্ষে রাখিযা অতীত সাক্ষী ইতিহাসের উপদেশ গ্রহণ কর, সুদীর্ঘ জীবনবর্ত্মে যত সন্দেহ উপস্থিত হইবে সে সকল নিরসন হইযা যাইবে। ভবিষ্য পুরাণের প্রযোজন হইবে না, অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্ত্তমান ও ভূতের ন্যায় ভাবীদর্শী হইযা সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে।

যে শিরোনাম দিযা প্রস্তাবটি লিখিতে আরম্ভ করা হইযাছে, যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয। ইহাতে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করা গিযাছে সে সকলের উত্তর লিখাও তজ্জন্যই নিষ্প্রযোজন। দুই চারিটি কথার উত্তর অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল। আপনাকে আপনিই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিযা তাহার মীমাংসা অভ্যাস করা সকলের কর্ত্তব্য, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ কযেকটি প্রশ্ন ও দুই একটির উত্তর লিখিত হইল। প্রশ্ন গুলির সদুত্তর পাইতে বালকগণ স্বযং চেষ্টা করিবে এই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নৈশ-নিসর্গ।

শোভানুভাবকতা একটী প্রধান গুণ। এই শক্তি, সকলের সমান পরিমাণে অথবা সমান অবস্থায থাকে না, কিন্তু সকলেরই কিছু না কিছু আছে। শোভার প্রকৃত মাধুর্য্য কবি আর প্রেমিক ব্যতীত অন্যে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কেহ শারদীয উষাকালে শেফালিকা স্থল-পদ্মাদি শোভিত কুসুম-কানন-সুষমায মুগ্ধ হন, কেহ বা

গম্ভীর রজনীতে দূরবীক্ষণ হস্তে লইয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বত, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দে মগ্ন রহেন। কেহবা বালিকার কুসুম-কোরক সদৃশ পবিত্র মুখচ্ছবি পাঠ করিয়া পুলক প্রকাশ করেন, কেহ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের গম্ভীর মুখশ্রীতে দেবোপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। ভাবুক ব্যক্তি সকল সময়ে সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের মধুরতা বুঝিতে সমর্থ। সঙ্গীতের শ্রুতি-সুখকর তরল-মাধুর্য্য, প্রকৃতির কুসুমময়ী অথবা পাষাণময়ী মূর্ত্তি, যুবতীর যৌবন-সলাম নয়ন-যুগল, কিম্বা বৃদ্ধের ললাট দেশস্থ চিন্তা রেখা, বালকের উদ্দেশ্য শূন্য কথা বার্ত্তা অথবা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বিজ্ঞান বিঘট্টিত সূক্ষ্মতত্ত্ব, সকলই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। তিনি বাহ্ন ও অন্তর্জগতের সূক্ষ্মদর্শী হইয়াও ভাবোন্মত্ত বাতুল, বাতুলবৎ বিচরণ করিলেও প্রকৃত সুখী। যদি সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে না পারে, তিনি গণ্ডারের খড়্গ অথবা মহিষের বিষাণ কিছুই গ্রাহ্য করেন না।

এক নিদাঘ প্রদোষে অশীতিবর্ষবয়স্ক এক বৃদ্ধ পণ্ডিত আগরা নগরীর সমীপস্থ যমুনাতটে প্রস্তর রচিত এক ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কবি ও দার্শনিক। তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ অভিনয়ে নানা অঙ্কে নানা দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। শতবজ্রে বিদীর্ণ, এবং শত দাবানলে উপক্রত পার্ব্বত্য শালবৃক্ষ যেমন স্থাণুমাত্রাবশিষ্ট অথচ অতিশয় দৃঢ়, বৃদ্ধও তদ্রূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স এত অধিক হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয় অবসন্ন অথবা দুর্ব্বল ছিল না, শুক্ল কেশ ব্যতীত অন্য বার্দ্ধক্য চিহ্নও দেখা যাইত না, তখনও তাঁহার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ক্ষমতা ছিল। বৃদ্ধ প্রদোষসমীরণ সেবন করিতেছেন, গম্ভীর মুখশ্রীতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তখন চন্দ্র উদয় হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে যমুনার নীলাম্বু নাচিয়া উঠিল। সমীপস্থ একটী সরোবর হইতে পদ্মের সুবাস এবং একটী কানন হইতে নানারূপ কুসুমসৌরভ বহন করিয়া মৃদুসমীরণ বৃদ্ধের নাসিকার নিকট ক্রীড়া

করিতে লাগিল। অদূরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ; তাহার গাঢ়কৃষ্ণ বর্ণ পত্রগুলি ভেদ করিয়া চন্দ্রমা-কৌমুদী প্রবেশ করিতে পারে নাই, কেবল উপরিভাগ রজতময় করিয়াছে, নিম্নভাগে গম্ভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, স্থানে স্থানে ছোট ছোট তরুগুল্মাদি প্রফুল্লতা মাখাইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার উপর কোকিলের কলকণ্ঠ, শামা, দয়েলের সুমধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। দুই এক খণ্ড মেঘ সঞ্চালনে অর্দ্ধচন্দ্র সময় সময় অর্দ্ধাবৃত এবং তাহাতে শ্যামলশোভিত কুঞ্জবন গুলি আলোক ও অন্ধকারে ঘোমটায় অর্দ্ধাবৃতা কুলকামিনীর বদন শোভা বিকাশ করিতেছে। অবনীর ললাম তাজমহলের মস্তক গৌরবের সহিত আকাশে উঠিয়াছে, কলধৌত কলানিধির বিমল কৌমুদীতে বিধৌত সেই কীর্ত্তি-রত্ন দূর হইতে স্ফটিকশুভ্র দেখাইতেছে। যমুনাতটে একটী দ্বিতল অট্টালিকা, তাহার সকল গুলি গবাক্ষ উন্মুক্ত, উপরের কক্ষটী অতি সুসজ্জিত; দীপমালার ঈষল্লোহিতজ্যোতি রঞ্জিত প্রস্তরপরম্পরায় প্রতিফলিত হইয়া পরম রমণীয় করিয়াছে। একটী ধনাঢ্য লোক বসিয়া আছেন, নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে সকলকে অপূর্ব্ব সুখ দিতেছে। সম্মুখে সুন্দর পুষ্পস্তবক। তাহার উপরিভাগে এক একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প তালবৃন্ত সঞ্চালনে দুলিতেছে। মধুর এস্রার বাদ্যে কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। সকলেই প্রফুল্ল। বৃদ্ধ এক একবার সেই দৃশ্য দেখিতে এবং সেই গান শুনিতে ছিলেন। নৈশ-নিসর্গের এই সুকোমল শোভা সকল তাঁহার অতুল্য হৃদয়কাব্যে সহস্রগুণ অধিক সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিতেছে। কবির মানস নয়ন এই সৌন্দর্য্যে বসিয়া রয় নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যেথানে যখন যে শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, স্মৃতি অতি সাবধানে তাহার চিত্র গুলি রাখিয়াছিল, এখন এই মধুময় সময় পাইয়া এক একটী দেখাইতে লাগিল। সুদূরে নিদ্রাগমনোন্মুখ বালকের ক্রন্দন শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব এবং লোকের কোলাহল শ্রুত হইতেছিল, তাহাতে

তাঁহার হৃদয় পরিদর্শনের ব্যাঘাত হইল না। তিনি একবার বাহ্যজগৎ, একবার অন্তর্জগৎ, একবার উভয়টী যুগপৎ মনে মনে পরিদর্শন করিলেন। নৈশ-নিসর্গের প্রিয়তম স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নিসর্গ কান্তির মধুরতায় একবার অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। ক্ষণে ভারবির আলোক ও অন্ধকারের বিরোধ স্থান গিরিগহ্বর, আবার কালীদাসের পলায়মান মৃগ নিরীক্ষণ করিলেন। এক সময় ভবভূতি বর্ণিত অষ্টম বর্ষীয়া সীতাদেবীর ললিত-ললিত অঙ্গশোভা, অন্য সময় মাঘকবিবর্ণিত শিশুপালের ভীম যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কল্পনাস্রোত মন্দীভূত হইল। যে চিন্তা অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত ছিল, তাহা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আপনার বাল্যকাল সমক্ষে উপস্থিত করিল।

বৃদ্ধ ভাবিলেন, “যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করিলাম, তখন কি অতি সামান্য বস্তুটিও অদ্যকার এই নৈশ-নিসর্গের কান্ত-কান্তি হইতে অধিক সুন্দর, অধিক মনোহর বোধ হয় নাই? পরমারাধ্য জনক যখন আশা বিস্ফারিত নয়নে আমার সেই কোমল অঙ্গশোভা অবলোকন করিতেন, স্নেহময়ী জননী যখন ক্রোড়ে লইয়া চাঁদ দেখাইতেন, একটী একটী করিয়া বস্তুর নাম বলিয়া দিতেন, কখন একটী রক্তিমকুসুম, কখনও একটী রঞ্জিত লাটিম হস্তে দিয়া মুখচুম্বন করিতেন; তখন কি সেই দৃষ্টি স্বর্গসুখ প্রদান করিত না? সেই চন্দ্র, সেই লালফুল, সেই বস্তু গুলি, সেই রঞ্জিত লাটিমটি আজিকার নৈশ-প্রকৃতির সুধাময়ী মূর্ত্তি হইতে অধিক সুন্দর অধিক মনোহর বোধ হইত না? তখন জ্ঞান ছিল না, ন্যায়শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিয়া কিছুই বিচার করি নাই; বিজ্ঞানের গন্ধ মাত্রও তখন হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তখন কি জন্য সকল বস্তু তত মনোহর বোধ হইত? অজ্ঞ ছিলাম, যাহা জানিবার জন্য তত সুখ ও উৎসাহ ছিল এখন জানিয়াও সে সুখ হয় না, ইহার কারণ কি? এ সকল বিতর্কে প্রয়োজন নাই। আজি অনেক কাল পর সুখের দিন উপস্থিত, একবার প্রাণ ভরিয়া সুখাস্বাদ গ্রহণ করি। অদ্য যেন

দেখিতেছি পূজ্যতম জনক মহাশয় সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, স্নেহস্বরূপা জননী তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রফুল্লবদনে দৃষ্টি করিতেছেন, আর দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আমাকে ডাকিতেছেন। অহো! দীর্ঘকাল পরে আমার কি অপূর্ব্ব সুখ! দীর্ঘকাল সংসারের সূর্য্যোত্তাপ, প্রবল ঝটিকা প্রভৃতির অত্যাচার সহ্য করিবার পর আজি বুঝি আবার আশ্রয় গৃহ লাভ হইল।

"ঐ যে স্তবকোপরি গোলাপ গুলি দুলিতেছে, আমার বোধ হইতেছে যেন আমার সন্তানগণ প্রফুল্লবদনে ক্রীড়া করিতেছে, গোলাপ যেমন অনিলসঞ্চালনে দুলিতে থাকে, বালক বালিকাগণও হাসিতে হাসিতে সেইরূপ বেড়ায়। আজি আমার মনে হইতেছে, যে দিন সন্তান সন্ততির নিশ্চিন্ত ক্রীড়া সন্দর্শনে ভূলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিলাম, সেই দিন উপস্থিত, সেই দিনের প্রদোষ সময়ের চিত্রটি স্মৃতি অতি সাবধানে আঁকিয়া রাখিয়াছে। আমি দেখিতেছি, কনিষ্ঠ তনয়াটি আমার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুখের দিকে তাকাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। আর দুইটী বালক ধূলিধূসরিত অঙ্গে অঙ্গনে ক্রীড়ানিমগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগ্নী সরলা তাহাদের শরীরের ধূলি মুছিয়া দিল, কএক ভাই ভগ্নী একত্রে গৃহ প্রবেশ করিল। সরলা গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপটী লইয়া যাইতে পারিল না, তাহার জননী আসিয়া ঘোমটার অন্তরালে প্রদীপটী লইলেন, তাঁহার সুন্দর মুখকমলে রক্তিম দীপালোক পতিত হওয়াতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল। আমি সেই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি নিরিক্ষণ করিলাম, বালকগণের সহিত আমোদ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে গৃহে গেলাম। কাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাহাকে দুইটী কথা বলিয়া উৎসাহিত করিলাম, কোনটীর আধ আধ কথা, কাহারও হসিত মুখচ্ছবি, কোনটীর বা বৃদ্ধবৎ গম্ভীরতার অনুকরণ, কোনটীর নূতন দুই একটী কথা আমার চিত্তবিনোদন করিল। আহা! এই জন্যই লোকে অপত্য কামনা করে, এই জন্যই এত ক্লেশ বহন পূর্ব্বক লোকে সংসারী হয়।"

বৃদ্ধ এইরূপ জাগ্রতস্বপ্নের মধুরতায় মত্ত রহিলেন, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্যজগতে তাঁহার নয়ন সঞ্চার হইল না। যমুনার নীলাম্বু অধিকতর কল্লোলিত করিয়া বড় বড় নৌকা গুলি যাইতেছিল, কোন নৌকা স্রোতোভিমুখে, কোন তরণী উজান পথে অগ্রসর হইতেছিল। দূরে একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত একজন আর্য্যপণ্ডিত সহ দূরবীক্ষণ হস্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, বৃদ্ধ সে সমস্ত দেখিলেন। জ্ঞান তৃষ্ণার বিষয় তাঁহার মনে হইল। ভাবিলেন, সামান্য বারিবিন্দু নির্ঝরিণীতে পরিণত হয়, নির্ঝরিণী প্রথমতঃ অপ্রশস্ত তটিনী, ক্রমে বহু বিস্তীর্ণা নদী হইয়া অনন্তসাগরগর্ভে প্রবেশ করে। জ্ঞান-তৃষ্ণাও তদ্রূপ, সামান্য বস্তুজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে দ্রুতগতিতে অনন্তাভিমুখে চলিয়া যায়। সুখের আশাও সেইরূপ। পঞ্চমবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজি পর্য্যন্ত দেখিবার বা শিখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রায় সমান আছে, কমে নাই, সুখ বাসনা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে মনুষ্যের এই সংসারজীবন অনন্ত নয়, তবে জ্ঞানের এবং সুখের আশা অনন্ত কেন? বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান!"

প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণে মুহূর্ত্ত জন্য যৌবনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধের মনোমধ্যে জাগরূক হইল। তিনি চারি দিকে কেবল হর্ষ চিহ্নই দেখিতে লাগিলেন, যে সুখ অনেক দিন ভুলিয়াছেন, তাহা এক বার এই জীবনের অপরাহ্ন সময়ে অনুভব করণার্থই যেন মনোহর কুসুম কানন গুলি একে একে পরিভ্রমণ করিলেন। লোকালয়ের কলরব এক বারে নিস্তব্ধ হইল, প্রমোদগৃহে দ্বিতল অট্টালিকার দ্বার সকল রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রসুপ্ত জগতে একাকী লোকালয় পার্শ্বে বসিয়া থাকিব না বলিয়া বৃদ্ধ উত্তরাভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। জ্যোৎস্না অস্ত হইল।

নৈশ-নিসর্গ এখন মনোহর শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর পরিচ্ছদ ধারণ করিল। জগৎ অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে, চারিদিক গম্ভীর নিস্তব্ধ,

কেবল পেচকের নীরস ধ্বনি, শৃগালের হোক্কা রব, দূরস্থ কুকুর গুলির ঘেউ ঘেউ শব্দে ক্ষণে ক্ষণে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। এই সময় আগরার সমীপস্থ পল্লী সকলে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে মৃত দেহ সকল সমাধিস্থলে লইয়া যাইতে বাহকগণ শব্দ করিতেছিল, বায়সের অমঙ্গলসূচক নৈশ-শব্দও সময় সময় শ্রুত হইতেছিল। বৃদ্ধ দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র তটিনীর তটে চিতা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। একটী চিতা-পার্শ্বে পুত্রশোকাতুরা জননী বক্ষে করাঘাত করিতেছেন, আর একটিতে একটী নবীনা ললনা স্বামীর চিতায় অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, গুরুজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে হৃদয়ের দুঃসহ শোকভাব প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার হৃদয় অধিক দগ্ধ হইতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্মুখস্থ শ্মশান হইতেও ভীষণতর।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে একটী পর্ব্বতারোহণ করিলেন, স্থিরভাবে বসিলেন; সংসারের মনোহরে এই ভয়ঙ্করের আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার অতীত জীবন স্মরণ হইল। এক মেঘান্ধকার রজনীতে যখন দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুমূর্ষু, প্রতিবেশীগণও নিকটে আসিল না, চিকিৎসক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন যে সংসারের অবলম্বন সেই প্রথম পুত্রটী বিকট মুখ ভঙ্গী করিল দেখিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিলেন, পরক্ষণে সংসার শূন্য করিয়া সেই বালকটী প্রস্থান করিল। তাহার জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, বৃদ্ধের আপন হৃদয়ও দ্রব হইল, একটী বাক্য স্ফুরণেরও শক্তি রহিল না সেই শোচনীয় দৃশ্য মনে পড়িল। একদিন দূর হইতে অশনিনিনাদ শ্রবণে তাঁহার অন্তরাত্মা আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠে। তখন ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া দৌড়িয়া গৃহে গেলেন। দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভয় সত্য,— সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দ্বিতীয় পুত্রটী বজ্রাহত, মৃত। গৃহস্থ অন্য সকলে অচেতন। সেই দৃশ্য মনে আসিল। প্রথম তনয়াটির নববৈধব্য সংবাদে গৃহ যেমন বিষাদপূর্ণ, চিত্ত যেরূপ আকুল হইয়াছিল, সেই হতভাগিনী

স্বামী-শোক বহন করিতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করাতে দুই দিন পরে তাহার স্ফীত, দুর্গন্ধময় মৃতদেহ নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক বৃক্ষ-শাখায় কিরূপে দুলিতেছিল, মনে মনে তাহাও দেখিলেন। দ্বিতীয়া কন্যাটিকে স্নান করার সময় কুম্ভীরে লইয়া যায়। তাহার মস্তক মধ্যে মধ্যে উত্তোলিত ও মধ্যে মধ্যে নিমজ্জিত হয়, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। পরিশেষে তাহার মৃত দেহের অর্দ্ধাংশ এক চড়ায় সংলগ্ন দেখিয়া মনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও মনে হইল। আর একদিন তাঁহার তৃতীয় পুত্রটী খেলিতেছিল, হঠাৎ সর্পে দংশন করিল, তাহার সুন্দর শরীর দেখিতে দেখিতে বিবর্ণ হইয়া গেল, কিছু-কাল ছট্ ফট্ করার পর তাহার মৃত্যু হইল। তাহার জননী সেই শোচ-নীয় দৃশ্য দর্শনে আপন মস্তকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, মস্তক হইতে শোণিত-স্রোত নির্গত হইয়া তাঁহাকে অচেতন করিল, তাহাও হৃদয়ে জাগরূক হইল। পরিশেষে সেই পতিপরায়ণা ললনা শোকে জর্জ্জরিত হইয়া যখন প্রাণত্যাগ করেন, স্বামীর নিকট শেষ দুই কথা বলিবেন আশয়ে তাঁহাকে আহ্বান করাইলেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণের সময় একটী কথাও বলিতে পারিলেন না, বাক্-রোধ হইল, অঙ্গুলী দ্বারা ললাট ও স্বর্গ বারেক মাত্র দেখাইলেন, চক্ষু অনন্তকালের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। নির্দয় স্মৃতি সে চিত্র-টিও আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিল।

বৃদ্ধ অতি সাবধানে অতীত জীবন পাঠ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী নানা স্থানে পরিভ্রমণান্তে অদ্য অভিজ্ঞতা ও স্বাস্থ্য সমভিব্যা-হারে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্ম ভূমিতে উপস্থিত। 'জন্মভূমি' সুমিষ্ট শব্দ, সুখময় স্থান। কিন্তু হায়! বৃদ্ধের কি অবস্থা। কোথায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন, কোথায় ভাই বন্ধু। জন্মভূমির ললামস্বরূপা জননী যাহার জীবিত নাই, তাহার গৃহই অরণ্য অরণ্যই আবাস স্থান।

আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত জীবন যেমন বিষাদপূর্ণ, তেমন আর কিছুই নহে। বাল্যকালে জনক জননী সংসারলীলা সংবরণ করেন, বৃদ্ধ তদবধি সংসারসুখ অনিত্য জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিলেন। তথাপি সময় সময় তাঁহার এই আশা ছিল, যৌবনে জ্ঞানোপার্জ্জনে, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র পরিবারের মৃদুতামাখা আচরণে এক দিন সুখী হইবেন। কিন্তু যখন মেঘাবরিত আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় এক একটির জীবনালোক নির্ব্বাপিত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের শেষ আশাও নিবিয়া গেল। দেশে দেশে বিচরণ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, সংসারে শান্তি নাই, সুখ নাই, সমস্ত বিষাদপূর্ণ। তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; ভাবিলেন, "হায়! যাহাতে সুখে বসতিবরণার্থ সমস্ত লোক এত ব্যস্ত, সেই চাক্‌চিক্যপূর্ণ সংসার কি এমনই বিষময় স্থান!

"প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক রাজপথে চলিতেছে, কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে, কিন্তু একজনও একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে না। অনন্ত আকাশে ভ্রাম্যমাণ ক্ষিপ্ত গ্রহের ন্যায় জীবগণ সর্ব্বদা অস্থির ভাবে বিচরণ করে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখের রেখা মাত্র দেখা যায় সত্য, কিন্তু দুঃখ যেমন তামস রজনীর নীরদ নীলিমায় অঙ্কিত, সুখাকাশে সুখ লেখা তাদৃশ বিস্পষ্ট দেখায় না। মেঘমালা হইতে ক্ষণপ্রভার প্রভার ন্যায় সংসারের ক্ষণিক সুখ সুন্দর হইলেও স্থায়ী বা নয়নের প্রীতিপ্রদ হয় না। বালকের স্বপ্নাবস্থার হাসি যেমন মনোহর, পরিবারপরিবৃত হইয়া অবস্থিতিও তদ্রূপ বটে, কিন্তু বালক যেমন হাসিতে হাসিতে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে চমকিয়া বা কাঁদিয়া উঠে, নানা রূপ বিপদের অত্যাচারে মনুষ্যেরও সেই দশা ঘটে।

"জীবন এবং মৃত্যু জীবধারীর পক্ষে প্রধান অনুশীলনের বিষয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রতিদিন নয়ন-সমক্ষে সহস্র সহস্র ঘটনা দেখিয়াও আমরা ভাবিতে শিখি না। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক জন্মিতেছে,

তেমনই আবার লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। জন্মের পূর্ব্বে আত্মা কোথায় ছিল, কি রূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করিল? আত্মা যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে, আত্মার অবস্থিতিও বিচ্ছেদ আছে। আত্মা কি সাকার? আত্মা কি শরীরসহ ধ্বংস হয়? উপাদান সকল কি ভৌতিক পদার্থে বিলীন হয়? এরূপ কম্পনা করা যায় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্ট হওয়া সম্ভবে না। অনন্ত আকাশের ন্যায় আত্মাও অনন্ত, তাহার আধার কম্পনা করা যায় না। জীবধর্ম্মাক্রান্ত কোন শরীর সৃজিত হইলে সর্ব্বব্যাপী আত্মা তাহাতে কার্য্য করিতে থাকে। আবার শোণিত স্রোত থামিয়া গেলে যখন শরীরের সজীবতা থাকে না, আত্মার কার্য্যও তদবধি শেষ হয়। যে অনন্তে ছিল, আত্মা পুনর্বার সেই অনন্তেই থাকে। আত্মার মমতা নাই, মায়া দেহের। আমাদের অঙ্গুলী প্রান্তে কন্টক বিদ্ধ হইলে কষ্ট বোধ করি, সে কষ্ট শরীরের জন্য, শরীর না থাকিলে মনের তাদৃশ কষ্ট হইবে না। আমাদের মৃত্যুভয় শরীরের নিমিত্ত, আত্মার নিমিত্ত নহে। আত্মা শরীরে যেরূপ কার্য্য করিত তাহা আর করিবে না, শরীরটি পচিয়া যাইবে। জলে জল, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা, আকাশে আকাশ মিশাইবে, এই কষ্ট। এখন আমাদের একটী স্থান আছে, আমরা সীমাবদ্ধ সুতরাং স্থানের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু দেহ না থাকিলে আমরা সীমাবদ্ধ প্রাণী কিরূপে অসীম অনন্তে সন্তরণ করিব, ধারণা করিতে পারি না, এই ভয়। এই সংসারে স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রণয়-বন্ধনে পরস্পরে পরস্পরের জন্য সুখী, সেই বন্ধন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ছিন্ন হইবে এই ক্লেশ!

"আত্মার কি স্নেহ মমতা থাকে না? আমি যাহাদিগকে আমা হইতে ভাল বাসিতাম, তাহারাত একবারও সাক্ষাৎ করে না? আত্মা অমর, ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে তাহারা আমাকে আসিয়া দেখিতে পারে। তবে না দেখার কারণ কি? ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ সংসারজীবনে বন্ধন-

কানন। যদি জগতে কোন স্থলে আত্মোৎসর্গ থাকে, তবে সে প্রণয়ে। প্রণয়ও কি আত্মাকে পরিত্যাগ করে? একথা বিশ্বাস হয় না। এখন দেহ-বন্ধন বা কর্ম্ম বন্ধন নাই সুতরাং দেহধারীর জন্য ভালবাসা প্রকাশ করিতে আত্মার প্রবৃত্তি জন্মেনা। এই দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া যখন অনন্তে অনন্ত চালিয়া দিব, তখন অবশ্যই সেই স্নেহ মমতার মধুরত্তা বুঝিতে পারিব। ভালবাসার বিকৃতি কপট স্নেহ, নয়ন-ভৃষ্ণা থাকিবে না সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়ের অমৃত ধারা হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবে। সংসারজীবন জীবের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আর ভাবনা কি? তখন শরীর সর্পেও দংশন করিবে না, কন্টকও বিঁধিবে না। আকাশের অশনি, জলের কুম্ভীর, বনের সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা শত্রু-লোকের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। যে অনন্ত জীবনের জন্য সকলে ব্যস্ত, সেই অনন্ত জীবন লাভ হইবে। তবে লোকের প্রাণ, মৃত্যু ভাবিয়া এত আকুল হয় কেন? যাহাদিগের জন্য আত্মা লালায়িত, তাহাদের অবশ্যই সুখের অবস্থা হইয়াছে, তবে তাহাদিগের জন্য আক্ষেপ স্বার্থ-পরতা মাত্র।

"পাপ পুণ্য কি? তাহার সহিত পরলোকের কি সম্বন্ধ? কেহ বলে যাহাতে সকলের হিত তাহা পুণ্য, যাহাতে সকলের অহিত তাহা পাপ। তবে যে কার্য্যে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই, সে কার্য্য কি? একজন ধনীর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দশ জন নিরন্নকে বিতরণ করিলে পাপ না পুণ্য হইল? কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যে কার্য্য করি তাহাই পুণ্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত পাপ। যদি তাহা হয়, তবে ধর্ম্মোদ্দেশে বলিদানাদি পাপ না পুণ্য? শুনা যায়, পূরাকালে কেহ কেহ ধর্ম্মোদ্দেশে নরবলি প্রদান করিত, তাহারা পাপী না পুণ্যবান্? কেবল হিত দেখিলেও হয় না, ধর্ম্ম আর স্বার্থ দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসারে জীবন যদি স্বার্থোৎসর্গ শিক্ষা করে, আত্মাকে নিরর্থক কষ্ট না দিয়া বিলাসাদি বিসর্জ্জন করিতে পারে এবং মনঃপ্রাণে অন্যের উপকারার্থ নিরন্তর অব-

স্থিত থাকে, কার্য্যে তাহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর থাকেন। অথচ শোণিতপাত, হত্যাকাণ্ড, ভয় বিভীষিকা না থাকে; যদি সে কার্য্য সম্পন্ন বরণানন্তর আত্মায় বিশুদ্ধ বিমল আনন্দ অনুভূত হয়, পরজ্ঞান না থাকে, যশের স্পৃহা একেবারে অন্তর্হিত হয়, তবে তাদৃশ কার্য্যকেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কার্য্য বলিব। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন একটী কুকার্য্য সৎকার্য্য জ্ঞানে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাধিত হইতে পারে, তাহাতে কুকর্ম্মজনিত পাপ অল্প হইলেও তাহাকে পুণ্যকার্য্য বলা যাইবে না।

"পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, সেই শাস্তি ও পুরস্কার কি? আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মা অমর। জীবিত থাকিবার জন্য অনন্ত তৃষ্ণাই তাহার অবার্থ প্রমাণ। আত্মার দেহ-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বই পরকাল। শাস্তি কি পরকালে হইবে? শরীর না থাকিলে আবার [illegible] কি? শরীরের যন্ত্রণা মাত্র মনে অনুভব হয়, শারীরিক সুখ ব্যাঘাতে মানসিক চিন্তা। আমরা যে পুস্তকাদি পাঠ করি, তাহার ফল প্রত্যেক ধমনীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শারীরিক সুখ উৎপাদন করে। অনুতাপানলে যখন হৃদয় দগ্ধ হয়, তাহার অবসাদ শরীরেই ভোগ করে। শরীরবিচ্যুত আত্মার তাদৃশ ক্লেশ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এক বর্ত্মের শেষ সীমা হইতে অন্য বর্ত্মে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সকল ভোগ সকল শাস্তি সম্ভব। রোগ শোক অনুতাপে, মানসিক অন্যবিধ যন্ত্রণায় এই পৃথিবীতেই সকল ভোগ, সকল শাস্তি হইতে পারে। পরলোকে আত্মার শাস্তি কল্পনা করিলে সে শাস্তি নিতান্তই লঘু হইয়া পড়ে। যদি আত্মার উন্নতি হইতে ব্যাঘাত জন্মে বা বিলম্ব হয়, তবে এই একটী শাস্তি গুরুতর সংশয় নাই। কিন্তু এস্থানে কৃতকর্ম্মের ফল লোকান্তরে ভোগ করিব একথা বিশ্বাস করিতে সহসা যেন প্রবৃত্তি জন্মে না, আত্মা আপনা হইতে কাঁপিয়া উঠে। এ আদালতের বিচারক্ষমতা ইহলোকেই সীমাবদ্ধ, পরলোক প্রাপ্ত হয় না। এদেশের বিচার এদেশের আইন দ্বারাই হইবে, অন্য দেশীয় আইন প্রযুজ্য নয়। বিচারপতি

অনর্থক সাধারণ বিচার-ক্ষমতা থাকা সত্বে অসাধারণ ক্ষমতা পরিচালন করার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। হেতু থাকুক আর না থাকুক, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত পরলোক আমাদের দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ অতীত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা হয় না। লোকের যেরূপ বিশ্বাস আছে, সেইরূপ বিশ্বাসই থাকুক। এ বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, জ্ঞান চাই না, ভ্রান্তিই ভাল। যে স্থানে অজ্ঞানতা সুখ, সেস্থলে বিজ্ঞ হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে, এই ভয় লোকহৃদয়ে জাগরূক থাকাতে লোকের পাপাচরণে ভয় আছে; সে ভয় তিরোহিত হইলে নীতি শাস্ত্র আর থাকে না। লোকে সাহসে নির্ভর করে এবং যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। তাহার সমক্ষে নরকের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করাই ভাল। ঐ যে দুইটী আত্মা আজি অনন্তে মিশিয়া গেল, যাহাদের পরিবারের আর্ত্তনাদে আজি নৈশ-নিসর্গ এত ভীষণ হইয়াছে, এবং সংসার বিষাদ মাখা বোধ হইতেছে, জীবিত থাকিতে তাহারা সুকার্য্য না কুকার্য্য করিয়াছে কে বলিবে? যখন এক পা এই ধরা ধামে রাখিয়া অন্য পা পরলোকে স্থাপন করিয়াছিল, তখন হয়ত ইহাদের মনেও সেই রৌরব কুণ্ড গুলি, সেই ভীমান্ধকার, পাপীদিগের ভীষণ আর্ত্তনাদ, সেই প্রতপ্ত লৌহ কটাহ, আলোক বিহীন অগ্নি, শ্বাস-নিরোধক-ধূম-পুঞ্জ, যম দুতের দণ্ড তাড়না প্রভৃতি উদয় হইয়াছিল। হয়ত পূর্ব্বকৃত পাপকার্য্য স্মরণপূর্ব্বক সেই পুরীষপুরিত কুণ্ড মধ্যে কল্পনার নির্দ্দয় তাড়নে পতিত হইয়া মুখোত্তোলনে প্রাণপণ্ করিতেছিল। জীবনে যখন কোন দুষ্কর্ম্মের বাসনা মনে সঞ্চার হইয়াছে, তখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ সমস্ত মনে হইয়া অনেকাংশে তোহাদ গকে ধর্ম্ম পথে রাখিয়াছে।

"আজি আমি অন্ধকারে অন্ধকার মিশাইলাম, আমার শোক-পূর্ণ অতীত জীবন আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। ভীষণ তরঙ্গায়িত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংসারে যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, সকল একবার ভাবিয়া

দেখিলাম। সেই তোয়নিধির তটাভিঘাতে যত আর্ত্তনাদ করিয়াছি, সমস্ত মনে হইল। জন-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া দিবাভাগে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি, লোকের উৎসাহে, লোকের আনন্দে সকল কথা ভুলিয়া থাকি, বালক বালিকাগণের উৎসাহপূর্ণ মুখচ্ছবি, যুবক যুবতীর প্রেমপূর্ণ প্রফুল্ল বদন, বৃদ্ধ বৃদ্ধার স্নেহমাখা গম্ভীর মুখশ্রী অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মৃতির সুকোমল অঙ্কে দিবাভাগে স্বচ্ছন্দে শয়ান থাকি। জগতের হসিত কান্তি সৌরালোকে প্রকাশ পায়, পশু পক্ষীর এবং মানবগণের প্রফুল্লতা কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, দিবাভাগে অতি রমণীয়, দিবসে কৌটিল্য ব্যক্ত হয় না, কুকর্ম্মও কেহ সাধনের সাহস পায় না। যাহার অভ্যন্তর কালিমা-পূর্ণ, সে ব্যক্তি রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সে কালিমা ঢালিয়া দেয়, অন্যে দেখিতে পায় না। যদি চিন্তা বিহীন মানব জীবন কল্পনা করা যায় এবং সে জীবনে পবিত্রতা থাকে, তবে সে জীবনের পক্ষে রজনী সুখ-সেব্য এবং পরম রমণীয় পদার্থ। শারদীয় পৌর্ণমাসীর রজনী পরিভ্রমণ, বসন্তের কুসুম-মাধুর্য্য-পূর্ণ শুক্লযামিনীতে নৈশ-নিসর্গ সন্দর্শন অতি মনোহর বটে, কিন্তু রজনীর যে ভীষণ অন্ধকার ভাঁগ আছে, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। আজিকার মত ঘোরান্ধকার রজনীতে ভারতের গৌরবরবি পৃথ্বীরাজ যবন হস্তে নিহত হন, কৃতঘ্ন ম্যাক্‌বেথ্ নিদ্রিত প্রভু ডনক্যানের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করে, পাপপরায়ণ সেক্সটস্ পবিত্র হৃদয় লুক্রীসীর সর্ব্বনাশ ঘটায়, নরপিশাচ রোমসম্রাট নিরো মাতৃহত্যা করে। এইরূপ রজনীতে মোগল সম্রাট শিরোমণি সাজেহান কারারুদ্ধ হন, এক কালনিশীথ সময়ে ভারত-বীরত্ব ভূমি চিতোর নগরী যবন হস্তে পতিত হয়।

"তস্করাদি দুর্ব্বৃত্তগণের পাপ চরিত্র একবার ভাবিয়া দেখ, রজনীর নিস্তব্ধ নীলিমা তাহাদের কেমন সহায়। এক দিকে তামসী নিশীথে যোগনিরত মহাপুরুষগণ পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করিতেছেন, পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক বিলোড়নে নিবিষ্ট আছেন, স্বদেশবৎসল উদার চরিত্র

মহোদয়গণ কিরূপে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন; কবিগণ কল্পনার লীলা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে একবার নভোমণ্ডলে, একবার ভূগর্ভে, একবার মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন, ছাত্রগণ সুনিদ্রার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পুস্তক সম্মুখে উপবিষ্ট, প্রণয়ীগণ প্রণয়ের পবিত্রালাপে রত। অন্য দিকে স্বার্থপর পাপ পিশাচ সকল পরস্বাপহরণে, পরের সর্ব্বনাশ সাধনে অথবা শোণিতপাতে নিযুক্ত হইয়াছে। একদিকে প্রফুল্লতার পবিত্র সলিলে হৃদয় মালিন্য ধৌত করিতেছে, অন্য দিকে পাপের পঙ্কিল সলিলে পাপচিত্ত কলঙ্কিত হইতেছে। সুখীগণ পর দিনের সুখের পথ অনুসন্ধানে নিবিষ্ট, দরিদ্র প্রভৃতি হতভাগ্যগণ অন্নচিন্তায় অথবা হতাশের মর্ম্ম-দাহে এখন দগ্ধ বিদগ্ধ। পুণ্যবান্ পুলক-পূর্ণ হৃদয়ে সদনুষ্ঠান স্মরণ করিতেছেন, পাপীগণ অতীত জীবনের কষ্ট স্মরণ পূর্ব্বক হয়ত পৃথিবীর নিকট বিদায় লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছে, না হয় অনুতাপের ভীষণানলে ভস্ম হইতেছে। আহা! অভাগাদিগের রজনীতে কি শোচনীয় অবস্থা! রোগীর বেদনাযুক্ত হৃদয়ের আর্ত্তনাদ, শোকার্ত্তের অন্তর্দ্দাহের যন্ত্রণা-জনিত-কাতরোক্তি, আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত ব্যক্তির হৃদয়ের শূন্য ভাব, সকলই ভয়ঙ্কর।

"এই সংসারে যে জানে 'আমার কেহ নাই', তাহার কি শোচনীয় অবস্থা! এই বিস্তীর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত জনস্রোত, উপরে অনন্ত আকাশ অনন্ত নক্ষত্রে পরিপূর্ণ, অনন্ত সময় রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব, অথচ দেখিব চারি দিক শূন্য, আমার কেহই নাই,— আমাকে আমার বলিয়া নিকটে দাঁড়ায় এমন কেহই নাই। যখন রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণায় মর্ম্মাহত হইয়া ছট্ ফট্ করিব, তখনও দেখিব আমাকে আমার বলে এমন কেহই নাই। যখন ঘাতক রজ্জু ধারণ করে, পদতল হইতে অবলম্বন কাষ্ঠ সরিয়া যায়, অন্তিমের ভীম ভুকম্পে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীও যখন সেইরূপ আমার পদতল হইতে সরিয়া

যাইবে, আমি নিয়তির বধ্য কাষ্ঠে অনিশ্চয় অবস্থায় ঝুলিতে থাকিব; দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে, পরমাত্মা অনন্তে বিলীনা হইয়া যাইবে; তখনও কেহ আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবে না, আমার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না। আজি এই অন্ধকার রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আমার ভবিষ্যৎ অঙ্কিত দেখিতেছি, সেই ভীষণ হইতে ভীষণতর চিত্র আমার আঁধার হৃদয়ও আঁধার করিতেছে। যামিনীর প্রথমার্দ্ধে নৈশ-নিসর্গের যে ভুবনমোহিনী কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, সে চিত্র এখন কোথায়? যৌবনের সুদূরবর্ত্তী স্মরকতার সময় ঐ চিত্রের উপযুক্ত ছিল, একণের প্রকৃতির এই সংহার মূর্ত্তি আমার বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী। কিন্তু আর ভাবিব না, আর চিন্তায় মন অবসন্ন করিব না। ঐ দেখ অন্ধকার দূর হইতেছে, উষার শীতল সমীরণ আমার ঘর্ম্মাক্ত কপোল স্পর্শ করিতেছে, রজনী প্রভাত হইল। এক দিন আমারও এই দুঃখ-রজনী প্রভাত হইবে, এই সীমাবদ্ধ সংসারে না হইলেও পরকালে বালার্কের রক্তিম কিরণাপেক্ষা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, দিব্যজ্ঞান পরমপুরুষ সন্দর্শনে সুদীর্ঘ জীবনের সকল ক্লেশ নিবারণ করিব;—আমার জীবনের অভিপ্রায় জীবনান্তে সফল হইবে। এ দেশ আমার মাতৃভূমি, নিন্দা করিতে সঙ্কোচ হয়, নিন্দাও করিব না। কিন্তু হৃদয়ের গূঢ়তম অংশ হইতে বলিতেছি, নিতান্ত অসহ্য যন্ত্রণায় প্রকাশ করিতেছি, ভারতভূমি এখন পুণ্য ভূমি নাই। সহস্র সমুদ্র বিধৌত হইয়া পুনরায় শুদ্ধি হউক, সকল আত্মা একত্র হইয়া সেই সুখরবি দর্শন করিব। আমার পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষগণ, স্নেহাধার সন্তানগণ সকলে একত্র হইয়া সেই অপ্নদৃষ্ট বিনির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হইব।"

চিতোর নগরী।

যখন যে দেশে জাতীয় অস্তিত্বের বিকাশ, তখন সে দেশে বীর ও বীরত্বের পূজা, এই নিয়ম চিরপ্রসিদ্ধ। কার্ত্তবীর্য্য, পরশুরাম, রাম, লক্ষ্মণ, দশানন, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, সেকেন্দরসাহ, সিসষ্ট্রিস্, সেমিরামিস্, সিজর্, হানিবল্, নেপোলিয়ন্, ওয়েলিংটন, মার্ল্‌বরো, ওয়াসিংটন, রিয়েনজী প্রভৃতি বীরগণের নাম চিরদিন বীরগণ কর্ত্তৃক সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইতেছে। সে দিন রুশিয়া ও তুরস্ক এই দুই দেশ মধ্যে যে ভীম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে তুরস্কের সেনানায়ক ওস্মান্ পাশা পরাজিত হইয়াও রুশিয়ায় শত্রুর স্থানে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, অনেক সম্রাটের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। বীর-ধর্ম্মপ্রিয় মহাত্মা কর্ণেল্ টড্, এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক পুস্তকের সুবিজ্ঞ লেখকগণ এবং অনেক নিরপেক্ষ ইংরেজ ভ্রমণকারী সহৃদয়তার সহিত রাজপুত-চরিত্র দেখিয়াছিলেন, এবং রাজপুতদিগের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্ত অপেক্ষা রাজস্থানের ইতিবৃত্ত উত্তমাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্তের সহিত রাজপুতনাবাসী দুই চারিজন শিক্ষিত লোকমুখে শ্রুত কিংবদন্তী ও ইদানীং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহা তুলনা করিয়া নিম্নে মিবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর নগরীর অতি সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিলাম। আমাদের জাতীয় বিকাশ নাই, আমরা বীরের মূল্যও জানি না; বীরের বীরত্ব বীরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

নৃপকুল-তিলক অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র লব, চিতোর নগরী নির্ম্মাণ করান। প্রথমতঃ ঐ স্থান নিতান্ত সামান্য অবস্থায় ছিল, ব্যায়াম শিক্ষার্থ যুবকগণ উপস্থিত হইত, মাত্র দুই চারিটী

অট্টালিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিবার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু যখন প্রমুরাবংশীয় বীরগণ ঐ নগরে বসতি আরম্ভ করেন, তদবধি নগরীর গৌরব ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে। বাপ্পারাও চিতোরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ হইতে ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত যবন দেশীয় রাজগণকে পরাভূত ও করদ করেন। কনস্তান্তিনোপলের তদানীন্তন সম্রাট তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইতে সাহস পান নাই। তিনি প্রচুর অর্থ এবং আপন দুহিতা সম্প্রদান পূর্ব্বক বাপ্পারাওর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন।

তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার বংশীয় খোমান নরপতি অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং দুর্ব্বল জ্ঞানে ইরান তুরান প্রভৃতি দেশের যবন-রাজগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা সফল হইল না; সিংহশিশু যেমন মৃগ-মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র মৃগ সকল ত্রস্ত পলায়ন করে, মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপে কুঝটিকা যেমন নিমেষ-মধ্যে অন্তর্হিত হয়, খোমান শত্রু মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র যবনগণও তেমনই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। খোমান নিরস্ত হইলেন না, চতুর্ব্বিংশ আক্রমণে যবনদেশ অধিকার করিলেন। অনন্তর বিখ্যাতনামা খলিফা হারুণলরসীদের পুত্র খলিফা সুলতান মহম্মদ মামুন্ দিগ্বিজয় উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। খোমান তাঁহাকেও পরাজয় এবং দেশ হইতে তাড়িত করিলেন।

প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে নিয়তি-নৈমির আবর্ত্তন হইল; চিতোরের সৌভাগ্যশশী কলায় কলায় হ্রাস হইতে লাগিল। যবনগণ পশ্চিম ভারতবর্ষ, এবং ক্রমে পূর্ব্বে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ অধিকার করিল। তখন কেবল রাজপুতনা স্বাধীন, কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যবনগণ বসিয়া রহিল না। গোলকুণ্ডার মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলে কে হীরক না উঠাইয়া নিরস্ত হয়?

কহিনুর মণি লাভ করিবার সুযোগ পাইলে কোন্ নির্ব্বোধ সেই সুযোগ ছাড়িয়া দেয়? একে উন্নতির সময়, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ; তাহাতে আবার স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষে উপর্য্যুপরি জয়লাভ হইয়াছে, সুতরাং মুসলমানগণ তখন শোণিতস্বাদ প্রাপ্ত শার্দ্দূলাপেক্ষাও ভীষণতর। তাহারা বীরত্ব ও ঐশ্বর্য্যাগার চিতোর ছাড়িবে কেন? চিতোরেশগণ বার বার তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এখন প্রতিহিংসা প্রদর্শনের প্রথম সুযোগ ছাড়িয়া দিবে কেন? খিলিজি বংশীয় আলাউদ্দীন খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রত্যুষ সময়ে অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে চিতোর অবরোধ করিলেন।

অনন্তর চিতোরেশ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যবনগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ভীম সিংহ, মৃত্যুজিৎ সিংহ এবং অজীৎসিংহ কিরূপে প্রাণত্যাগ করেন, সৌন্দর্য্যসমষ্টি পদ্মিনী সতী কি প্রকারে পাবকের প্রদীপ্ত শিখায় আপনার রূপরাশি ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পদ্মিনীর সহিত চিতোরের সৌভাগ্য শশী অস্তমিত হইল, মিবার দীল্লির করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল।

কিছু দিন গত হইলে মেঘান্ধকার রজনীতে দুই একটী নক্ষত্রের ন্যায় মিবারের শুভ্রজ্যোতি পুনরায় প্রকাশ পাইল। ১৩১০ হইতে ১৫২৭ খ্রীষ্টীয় সন পর্য্যন্ত মিবার এবং অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের পুনরায় পূর্ব্ব পরাক্রম ও গৌরব প্রকাশ করিবার সুবিধা হইল। শেষ ভূপতি মহারাণা সংগ্রামসিংহ তিন শত রাজাকে করদ করিলেন, ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাঁহার অপ্রতিহতগতি রোধ করিতে পারিল না। মহারাণা যখন করদ রাজগণ সমভিব্যাহারে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইতেন, তখন কেহই আর তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায় নাই। তদনন্তর পশ্চিমদেশ হইতে এক নূতন শত্রুর আবির্ভাব। মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তা বাবর স্বদেশে অকৃতকার্য্য হইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী যেন এতদিন নিরাশ্রয় ছিলেন,

তাঁহাকে দেখিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। যিনি বিক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন, শত শত নরপতি যাঁহার পদচুম্বন করিত, সেই চিতোরেশ মহারাণা সংগ্রামসিংহ ফতেপুরশিক্রীতে বাবরের নিকট পরাভূত হইলেন। মোগল সিংহাসন দীল্লিতে স্থাপিত হইল। চিতোর একবার উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু এই পতনে আর পূর্ব্ববৎ গৌরবের সহিত উঠিতে পারিল না।

বাবরের রাজপুত রাজ্য সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার সাধ্য বা সামর্থ্য ছিল না। যশ তাঁহার প্রধান কামনা, মহারাণাকে পরাস্ত করাতে তাহা লাভ হইয়াছে সুতরাং দীল্লির সমীপবর্ত্তী দুর্ব্বল রাজ্য সকল অধিকার করিয়া নীরব রহিলেন। কিন্তু চিতোরে এক নূতন শত্রু উপস্থিত হইল। আকাশে যেমন অমঙ্গলের ঘোষণা স্বরূপ ধূমকেতু উদয় হয়, মোগলের গৌরবাকাশ বিপন্ন করার জন্য সেইরূপ সেরসাহ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার তীব্রতেজ, ক্ষিপ্রগতি, তীক্ষ্নবুদ্ধি, অসাধ্য সাধন করিতে লাগিল। বঙ্গদেশ হইতে জয় করা আরম্ভ হয়, দীল্লিতে উপস্থিত হইবামাত্র হুমায়ুন তাঁহার চরণতলে বাবরের যত্নোপার্জ্জিত সিংহাসন খানি রাখিয়া পারস্য দেশে পলায়ন করেন। সেরসাহ সম্রাট হইলেন। বিজয়ের বলবতী বাসনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি অন্যান্য দেশ অধিকার করিলেন এবং পরিশেষে রাজপুত রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চিতোরাবরোধের প্রয়াস পাইলেন। তিনি অনেক যত্ন, বিশ্বাসঘাতকতা, ছল চক্রান্ত অবলম্বন করিয়াও চিতোরের দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে "একমুষ্টি ভুট্টার লোভে কি স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ হারাইব ?" এই কয়টী কথা বলিয়া রাজস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চিতোরের আবার কএক দিন বিশ্রাম; কিন্তু সেই বিশ্রামই শেষ বিশ্রাম।

মোগল মুকুটরত্ন আকবরসাহ বীরভূমি অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আযোজনের ত্রুটি হইল না। দীল্লির সমগ্র সৈন্যবল সঙ্গে

লইয়া রাজস্থানে প্রবেশ করিলেন। তিনি চিতোর নগরী অবরোধ করিবামাত্র রাজা উদয়সিংহ ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। সম্রাটের এই ধারণা ছিল, রাজা পলায়ন করিয়াছেন, আর জয় লাভে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু তাঁহার ভ্রম অল্প দিনেই বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত দিনের অবরোধে দুর্গের যে অপচয় হয়, জয়মাল রজনীতে তাহা সংশোধন করেন। এই ভাবে অনেক দিন গেল। যখন দুর্গের বাহিরে যুদ্ধ হয়, তখন চিতোরের প্রধান সেনাপতি ভীম পরাক্রমে মোগলদিগকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া উঠান। দুর্গাভ্যন্তরে জয়মালের কৌশল, বাহিরে পুত্তের পরাক্রম উভয়ই দুর্ব্বার। সম্রাট বুঝিলেন, যুদ্ধ এক প্রণালীতে না হইলে রাজস্থানে জয় লাভের আশা বৃথা, সুতরাং পূর্ব্বে দুর্গাধিকার, পরে একটী যুদ্ধ করা স্থির হইল। ঘোষণা দিলেন, "যে ব্যক্তি দুর্গ প্রবেশের পথ করিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন"। একজন বেলুচিস্থানবাসী দস্যু আকবরের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সামান্য সৈন্যের ন্যায় সকলে তাহাকে বিবেচনা করিত। সে রজনীর অন্ধকার সহায় করিয়া ছদ্মবেশে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি জয়মাল দুর্গের দুর্ব্বলাংশ সকল পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্কার করাইতেছিলেন, অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদ যথাস্থানে রক্ষা করিতেছিলেন। সে সময় ইয়োরোপীয় গোলা বারুদের ব্যবহার এদেশে আরম্ভ হয় নাই, দুর্গভেদ করার জন্য নিতান্ত অপকৃষ্ট প্রণালীর কামান ও বারুদ ব্যবহার হইত। তাহার উপযুক্ত রক্ষণোপায় ছিল না, সহজেই সমস্ত বিপক্ষের হস্তগত হইতে অথবা একবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বারুদে পড়িয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিত। দস্যু সেই অবস্থা দেখিল এবং জয়মালকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল। তাহাতে জয়মালের হটাৎ মৃত্যু এবং দুর্গপ্রাচীর ভেদ হইল।

কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, আকবরসাহ স্বহস্তে গুলি নিক্ষেপ

করেন। তাহাতে জয়মাল নিহত হন। কেহ বলেন, আকবরের প্রেরিত চর এই অন্যায় যুদ্ধে বিপক্ষগণের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কিন্তু মিবারের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস এই, এই নৃশংস ব্যাপারে সম্রাটের কোন দোষ ছিল না। বরং পুরস্কার প্রার্থী দস্যুর শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণের যে সন্দেহ ছিল তাহাও ক্ষালন করেন।

জয়মালের মৃত্যুর পর সম্রাট একটী সম্মুখ যুদ্ধে চিতোরের বীরকুল নির্ম্মূল করিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি আপন সৈন্য দুই দলে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং এক দলের সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক এক দিকে এবং অন্য দল প্রধান সেনাপতির আদেশানুযায়ী অন্যদিকে আক্রমণ করার সঙ্কেত দেখাইলেন। চিতোরে তখন একমাত্র পুত্তই সেনাপতি। জয়মালের অভাবে তাঁহার সাহস অনেক হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। একদলের সঙ্গে তাঁহার ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সম্রাট বিপরীত দিক হইতে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পুত্তের পরাক্রমে মোগল সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইল। তাহারা শীঘ্র সাহায্য না পাইলে আর স্থির থাকিতে পারে না। হয় তাহাদের পলায়ন করিতে, না হয় তখন প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইতে হইবে, একথা তাহারা বুঝিতে পারিল। পুত্তের জননী অশ্বারোহণে রঙ্গভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি আপন তনয়ের দেবোপম পরাক্রম সন্দর্শনে প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন সম্রাট আসিতেছেন, দুই সৈন্য মিলিত হইলে আর রক্ষা থাকিবে না, চিতোরের পতন নিশ্চয়; তখন বেগে অশ্বচালনা করিলেন। গৃহে গিয়া দেখিলেন একটী পুরুষ সৈন্যও নাই, তাঁহার সহিত স্বদেশ রক্ষার্থ রঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত হয় এমন একজন ভৃত্যও নাই। তখন ভগ্নহৃদয়ে আপন তনয়া কর্ণবতী এবং পুত্রবধূ কমলা দেবীর সুকোমল অঙ্গে বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করাইলেন। তাঁহারা পুত্তজননী কর্ম্মদেবীর আদেশ মতে

অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। কর্ম্মদেবী পাষাণ প্রতিমা! তিনি অগ্র-সর্ব্বস্ব বঙ্গমহিলার ন্যায় বিপদে বিহ্বল হইতেন না, বিপদের সময় তাঁহার সাহস শতগুণ বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনেক পুরুষাপেক্ষা প্রশংসনীয় ছিল। কর্ম্মদেবী প্রথম দৃষ্টিতেই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাম পার্শ্বে কন্যা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পুত্রবধূকে লইয়া এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাট সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনটী স্ত্রীলোক তাঁহার পথাবরোধের প্রয়াস পাইয়াছে। কিঞ্চিৎ হাসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের যে কি ভীম পরাক্রম প্রকাশ পাইবে, তিনি তাহা স্বপ্নেও ভাবিলেন না। এক দিকে সম্রাটের অযুত সৈন্য, অন্য দিকে তিনটি অবলা, কি অসমযুদ্ধ! তথাপি ললনাত্রয় টলিলেন না, রণপয়োধির ভীষণ আবর্ত্ত সন্দর্শনেও তাঁহাদের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক হইল না। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। দুই প্রহর অতীত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিল তথনও ললনাত্রয় যুঝিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণবর্ত্ম এবং দুই চারিটী বৃক্ষলতিকায় রাজপুতাঙ্গনাত্রয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।

পুত্রসহোদরা কর্ণবতীর বয়স ষোড়শবর্ষ মাত্র। তিনি অবিবাহিতা। কমলা দেবীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ, পুত্রের পঞ্চবিংশ বৎসর। অল্প দিন হয় পুত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। বালিকা যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করে, নবপরিণয়ের প্রণয়-মদিরায় বিহ্বলা থাকে, প্রণয়-বহিভূর্ত সংসার একবার তাকাইয়াও দেখে না, প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে সংসার-স্রোতে সুখে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, কমলা দেবীর এখন সেই সময়, জীবনের সেই পূর্ণিমারজনী। কিন্তু হায়! এই সময়ে এই অবস্থা। দেশ মধ্যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত। পূর্ণিমার রজনীতে মেঘান্ধকার।

কর্ণবতী বালিকা হইলেও রাজপুতদুহিতা, যুদ্ধ করিতে পারিতেন। কমলাদেবী নবীনা কিন্তু বীরাঙ্গনা। কর্ম্মদেবী বৃদ্ধা হইলেও বীরপ্রস-

বিনী! কেহই মৃত্যুকে ভয় করিলেন না। কমলাদেবী শুনিলেন, প্রাণকান্ত বিপন্ন। তখন তাঁহার কুসুমমালা মনে হইল না, স্বর্ণাভরণ মনে আসিল না, জীবনের মূল্য বা আশা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না, মৃত্যুকালে শার্দ্দূলী যেমন শিকারীকে বধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেইরূপ যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তি কর্ম্মদেবী অপেক্ষাও কঠিনহৃদয়া, বালিকা বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করে না, হৃদয়ের কোমলতা অথবা শরীর-মার্দ্দব কাহারও বাঁচিবার হেতু নয়। দেখিতে দেখিতে কর্ণবতী ভূশায়িনী হইলেন। পাষাণহৃদয়া জননী সে দৃশ্য দেখিয়াও দেখিলেন না, তনয়াকে উঠাইতেও প্রয়াস পাইলেন না। যে সময়ে তনয়াকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন সেই সময় মধ্যে বিপক্ষগণ বর্ত্ম অতিক্রম করিতে পারিবে। তাহা হইলে মাতৃভূমি মিবার রাজ্য, রাজধানী চিতোর নগরী, স্বাধীনতা, সুখ, পুত্রের জীবন সকলই বিপন্ন হয়, রাজস্থান যবনের চরণতলে গড়াইয়া পড়ে, এই ভয়ে প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম মাতৃস্নেহ এস্থলে ব্যর্থ হইল। কর্ণবতী আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "মা! চলিলাম!" জননীর হস্তে অস্ত্র চলিতেছে, পদে অশ্ব তাড়িত হইতেছে, মুখে বলিলেন, "ভয় নাই অগ্রসর হও, আমিও আসিতেছি।"

একটী জ্বলৎ-কন্দুক কমলাদেবীর বাম হস্ত বিদীর্ণ করিল। আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, ধন্য সহিষ্ণুতা, এক পাও টলিল না। তিনি স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আকবরসাহ লজ্জায় অবনত বদন, কিন্তু সৈন্যদিগকে বার বার সতর্ক করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় ললনাত্রয়কে বন্দী করিতে পারিবে তাহাকে সহস্র সুবর্ণ পারিতোষিক দিবেন। কিন্তু রণ উন্মত্ত, সে নিষেধ মানিল না। কর্ম্মদেবী এবং তাঁহার পুত্রবধূ উভয়ে ভূতলে শয়ন করিলেন।

পুত্ত সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহার হস্তে তাঁহার জননী ও সহ-

ধর্ম্মিণী নিহত হইয়াছিলেন, নিমেষ মধ্যে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিলেন না। এক হস্তে বৃদ্ধা জননী এবং অন্য হস্তে কমলাদেবীকে উঠাইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। একবার আর্দ্র হৃদয়ে পূর্ণ নয়নে প্রণয়িনীর দিকে তাকাইলেন। কমলাদেবী একবার প্রাণকান্তের মুখ দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন "এখন বিদায়।" পুত্তের হৃদয় বর্ম্মে সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু সেই কথাটিতে বিদীর্ণ হইয়া গেল! অনন্তর দেখিতে দেখিতে কমলাদেবীর জীবন দেহ হইতে অন্তর্হিত হইল। কর্ম্মদেবী বলিলেন "বাছা! আমি পাষাণ প্রতিমা। আমার মায়া মমতা নাই, আমি আপন তনয়া ও পুত্রবধূকে হত্যা করিলাম, কিন্তু দেশের উপকার হইল না! তুমি যাও। দেশের উপর বিপদ, এখন আপনার শোক দুঃখ প্রকাশের সময় নয়।" বলিতে বলিতে তনয় সমক্ষে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে চিতোরের স্বাধীনতা সূর্য্যও অস্তমিত হইল। পুত্ত যদি আর এক ঘন্টা পূর্ব্বে গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাঁহার সঙ্গে যদি অল্প সংখ্যক সৈন্যও থাকিত, তথাপিও এদশা ঘটিত না, হয়ত রাজপুতনার ইতিহাস ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত। কিন্তু সে দৈব ঘটনা কে খণ্ডন করিবে?

এখন আর সংসার-বন্ধন রহিল না। পুত্ত নির্ভীক হৃদয়ে শত্রু মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত্রিয় মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহারা স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত। সকলে একত্র হইয়া মোগল সৈন্য মধ্যে তুমুল হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। শত্রু মিত্র ভেদ রহিল না। সতৃষ্ণ তরবারি লোলজিহ্ব, শোণিত রসাস্বাদনে লালায়িত, শত্রু হউক, মিত্র হউক, যে সম্মুখে আসিল অমনি তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পুত্তও ভূশায়ী হইলেন। রাজপুত আর অবশিষ্ট রহিল না। চন্দ্রের ক্ষীণালোকে আকবরসাহ দেখিলেন তাঁহার পতাকা অক্ষত রহিয়াছে। তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ের চিহ্ন স্বরূপ আপন পতাকা চিতোরের দুর্গোপরি উত্তোলন করিলেন।

পুত্রের প্রার্থনানুসারে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার পত্নীর মৃতদেহের সহিত একত্রে এক চিতায় স্থাপন করা হইয়াছিল। মুমূর্ষু বীরের এই শেষ প্রার্থনা সম্রাট পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে দম্পতীর অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন হইল, কিন্তু তাহাও কেহ জানিলেন না। জীবনসহ পার্থিব সুখ চলিয়া গিয়াছিল। নিমেষ মধ্যে সম্রাটের হিন্দু সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড হুতাশনে ভস্মীভূত করিল। কর্ম্মদেবী এবং বর্ণবতীও সেইরূপ পৃথিবীর শেষ সৎকার লাভ করিলেন।

সম্রাট্ দেখিলেন গৃহে গৃহে অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজপুত ললনাগণ আপন সন্তানদিগকে অগ্রে সেই অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দলে দলে সেই অনলে আপনারাও ভস্ম হইতেছে। আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বস্ত্র দ্বারা নয়ন আবরিত করিলেন। যাহাদের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইত, আজি সেই বীরগণের বাসগৃহ তাহাদের পরিবারের শ্মশান। সম্রাট্ সেই শোচনীয় দৃশ্য সন্দর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "হায়! আমি আমার অধিকাংশ সৈন্য বিনাশ করিয়া যে জয় ক্রয় করিলাম, তাহাতে আমার কি লাভ হইল? দেশ শ্মশান, প্রজা আরণ্য জন্তু! যদি আমি ললনাত্রয় এবং জয়মাল ও পুত্তকে জীবিতাবস্থায় রাখিতে পারিতাম, তবে যশোলাভ হইত, সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেশ জনশূন্য করিয়াছি, অনুতাপের মুর্ম্মুর-দাহে আমার অবশিষ্ট জীবন গত হইবে।"

সম্রাট্ আপন জীবনীতে রাজপুত-চরিত্র অতি বিশদরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকৃত বীর ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ও যে তাদৃশ প্রশস্ত ছিল, সেই রাজপুত-প্রশংসা পাঠ করিলে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি যত্নের সহিত চিতোরের দুর্গ সমীপে এবং স্থানে স্থানে রাজপুত ললনাত্রয় এবং পুত্ত ও জয়মালের মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক আপন মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তদনন্তর উদযপুর মিবার রাজ্যের রাজধানী হয়। রাণা উদয়সিংহ অরণ্য মধ্যে ঐ নগর নির্ম্মাণ করেন। রাজধানী স্থানান্তরে নীত হইল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য পরিত্যাগ করিল না, মহারাণা উদযসিংহ ও প্রতাপ সিংহ সম্রাট্ আকবরের নিকট পরাজিত হন। তদনন্তর সম্রাট্ সাজেহান আক্রমণ আরম্ভ করিযাছিলেন, সম্রাট্ আরংজীব সূর্য্যবংশীয রাজাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছনা দিযা যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিলেন। কেবল মহারাণা রাজসিংহ আপন স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষ করিযাছিলেন. তাঁহার পর মিবারের শ্রী ক্রমে অস্তমিত হয। শেষে মিবার ব্রিটিশ রাজ্যের অনুগ্রহপ্রেক্ষী। এই শোচনীয বিষয অথবা অল্পদিন হইল ব্রিটিশ রাজসূয উপলক্ষে যে সকল কষ্টজনক ঘটনা আমাদের নযনসমক্ষে লবের বংশধরগণের অদৃষ্টে ঘটিযাছে তাহা আলোচনা করিবা প্রযোজন নাই, ইতিহাস মাত্রেই সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিযা দিবে।

আমরা এস্থলে রাজপুতদিগের আত্মবিগ্রহাদি সম্বন্ধে কিছুই বলিব না; কিরূপে চিতোর রাজপুতনার অন্যান্য নগরী হইতে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হয, তাহাও আমাদের বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে। বিদেশীয ইতিহাসে চিতোরের যে সম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধে কএকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। উদার প্রকৃতি ইতিহাস প্রণেতা মহাত্মা কর্ণেল্ টড্. রাজস্থানের ইতিহাসে প্রায কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। তিনি নিজেও একজন রণব কুশল ব্যক্তি ছিলেন, বীরের বীরত্ব লিখিতে লিখিতে আপনি মোহিত হইযাছেন। তিনি রাজপুতদিগের যে চিত্র প্রদান করিযাছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান রাজপুতদিগের তুলনা করিতে হৃদয দুঃখে বিদীর্ণ হয-তিনি কাই সাহেবের ন্যায অল্প কথায রাজপুত সিপাহীচরিত্র বর্ণন করেন নাই। কাই সাহেব তাঁহার সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে কএকটী কথায সিপাহী দিগের চিত্র প্রদান করিযাছেন। কর্ণেল রাজপুতদিগের সৈনিক কার্য্য হইতে, প্রত্যেক বিষয হইতে চরিত্র চিত্রিত, করিতে প্রযাস

পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রের যে স্থানে বর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা যথাযোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কর্ণেল টড মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, রাজপুতনার প্রতি পল্লী মারাথন, প্রতিবর্ত্মে থারমপলি; রাজস্থানে প্রতিগৃহে লিওনিদাস ছিল। তিনি রাজস্থানের ইতিহাস যথাতথ সঙ্কলন করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরকে উপহার দেন এবং এই বলিয়া অনুরোধ করেন, যে পৃথিবীতে যদি কোন জাতি স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়, তবে সে জাতি রাজপুত, যদি কেহ স্বাধীনতার মূল্য জানে, তবে সে রাজস্থানবাসী; অতএব রাজপুতদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য রাজা সেই সহৃদয় মহাত্মার অনুরোধ শুনিলেন না।

এখন একবার সেই রাজস্থানে পরিভ্রমণ কর, মেষশাবক যেমন তৃণাস্বাদনে এবং নির্ঝরিণীর জল পানে সুখী ও শান্তভাবে বিচরণ করে, রাজপুতদিগের সেই অবস্থা, অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। গৃহে গৃহে শান্তি বিচরণ করে, নির্ব্বাত প্রদেশস্থ জলাশয়ে কুম্ভিকা যেমন একটীর সহিত অন্যটী সংলগ্ন হইয়া থাকে, স্থানত্যাগ করে না; রাজপুতদিগের সেই অবস্থা। শান্তির সুকোমল অঙ্কে রাজপুতগণ সুখে নিদ্রা যাইবে, চিতোর নগরী অরণ্যপূর্ণ, উদয়পুর হতশ্রী, রাজপুতনা নির্জ্জীব। যদি আজি কেহ রাজপুতনার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে বসেন, টড সাহেবের ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠা উপন্যাস জ্ঞানে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই।

ভিক্ষাবৃত্তি।

ভারতবর্ষ হৃদয়ের জন্য চির প্রসিদ্ধ, অন্য কিছু থাকুক, আর না থাকুক ভারতবাসিগণের হৃদয় আছে। তাহাদিগকে দরিদ্র বল, মূর্খ বল, হতভাগ্য বল, সকলই সহ্য হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে হৃদয়বিহীন বা অকৃতজ্ঞ বলিওনা। দয়া, মমতা, ও কৃতজ্ঞতা তাহাদের সম্বল,

স্বার্থোৎসর্গ শাস্ত্র-বিহিত সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। যে পাশ্চাত্য লেখক "ভারতবর্ষীয় ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ নাই, সুতরাং ভারতবাসিগণ অকৃতজ্ঞ," এইরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ভ্রান্ত আর দ্বিতীয় নাই। যে দেশে ব্রাহ্মণগণ সমস্ত জীবন জ্ঞানোপার্জ্জনে এবং অন্যের উপকার সাধনে ব্যয় করিতেন, আপনারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ পূর্ব্বক পরের জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়নে অবহিত থাকিতেন, গয়াশ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান করিতে হইলে প্রথমতঃ বিমাতার পিণ্ডদান, তদনন্তর আপন জননীর এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, অথবা অন্য কেহ নাই, তাহাদেরও উদ্ধারার্থ শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে হিন্দুগণ সর্ব্বদাই অবহিত আছেন, যে দেশে জনক জননী এবং দেব দেবীতে প্রভেদ নাই, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে সেবা ও অর্চ্চনা লাভ করেন, যতকাল পিতা মাতা জীবিত থাকিবেন, সন্তানগণ আজ্ঞাকারী ভৃত্য, সর্ব্বদা তাঁহাদের সন্তোষ সাধনে এবং সুখে রাখিতে মনোযোগী, আবার তাঁহাদের পরলোক হইলে সন্তানগণ কষ্টব্রত অবলম্বন করে, পরলোকগত জনক জননীর উদ্দেশ্যে দান, ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান এবং শ্রাদ্ধাদি অতিশয় পবিত্রভাবে সম্পাদিত হয়। যে দেশে পরমোপকারী গবাদি পশুর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দেবোপম ভক্তি, পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে যে দেশ চিরবিখ্যাত, সেই দেশের অধিবাসিদিগকে অকৃতজ্ঞ অথবা স্নেহ মমতাবিহীন বলা নিতান্ত স্থূলদর্শী এবং অন্তঃসারবিহীনের কার্য্য সন্দেহ নাই।

ভিক্ষাদান হিন্দুগণের হৃদয়শীলতার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। অতিথিসৎকার এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারে অবস্থিতি, দয়ামমতা এবং সহিষ্ণুতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় জাতি সকল স্বতন্ত্র অবস্থানে এবং নিঃসম্পর্কীয়বৎ আচরণে আপনাকেও পরবৎ করেন, কিন্তু এদেশীয়গণ একান্নবস্থায় বসতি করাতে পরও তাহাদের আপন হইয়া উঠে।

হিন্দুদিগের ন্যায় অহিংসা ও পরোপকারব্রত অন্য জাতীয় লোকের দেখা যায় না। ব্রাহ্মণগণ প্রাণীগণের রক্ষার্থ অন্যূন শত অন্ন প্রত্যেকে প্রতিদিন আহারের সময় পরিত্যাগ করেন, প্রাণ বায়ুর উদ্দেশ্য জীবগণের আহারার্থ কিঞ্চিৎ যথানিয়মে মৃত্তিকায় রাখিয়া দেন। কেহ কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা প্রধান কর্ত্তব্য জানেন।

মুষ্টিমিত ভিক্ষাদান হিন্দুদিগের নিত্যকর্ম্ম। যে কেহ কেন দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার্থী না হউক, নিজের আহারোপযুক্ত তণ্ডুল থাকুক আর না থাকুক, তাহাকে বিমুখ করা হইবে না। দরিদ্রদেশ, মুষ্টি-তণ্ডুল সাধারণ দান। কিন্তু এই দান নিতান্ত দরিদ্র গৃহস্থেরও প্রাত্য-হিক কার্য্য। দ্বারে দ্বারে এক এক মুষ্টিতণ্ডুল ভিক্ষা করিলে দশ দ্বারে যাইতে হয় সত্য, তাহাতে ভিক্ষুকের কিছু অসুবিধা জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মুষ্টিমিত ভিক্ষা শত ব্যক্তিকে দিতে হইলেও, একে একে দিতে হয়, একত্র প্রয়োজন হয় না, এজন্য দাতা কোনও কষ্ট বোধ করে না। এইরূপ ভিক্ষাদান ধর্ম্মের উপদেশ, সুতরাং অবশ্য প্রতিপালনীয়। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের মধ্যেও এই নিয়মটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উপায়ে দীন, দরিদ্র, অনাথ ব্যক্তি-গণ কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখপ্রেক্ষী বা গলগ্রহ না হইয়াও অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ধনীদিগের অতিথিশালা আছে। কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি সামান্য গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হন, হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই নিয়ম অন্য দেশে নাই। সমৃদ্ধিশালী নগরী, অথবা সামান্য পল্লী যেখানে যাও "হোটেলে খাদ্য প্রস্তুত আছে, পয়সা দেও, আহার কর," অন্য দেশে এই সাধারণ নিয়ম।

ভারতবর্ষের লোকে কথায় কথায় নাটকাভিনয় জানে না। তাহারা কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'উপায়হীন

ব্যক্তি বলে না, অথবা রুমাল দ্বারা নয়ন আবরণ পূর্ব্বক নীরব থাকে না। হৃদয়ে যাহা বোধ করে শারীরিক পরিশ্রমেই হউক, অথবা অর্থ দানেই হউক, তাহা কার্য্যে পরিণত করে। এজন্য তাহারা প্রশংসা চায় না, এ তাহাদের নিত্যকর্ম্ম।

একটী শব্দ লইয়া দেখ, দেশে দেশে কত প্রভেদ! যখন আহার্য্য-বস্তু যোটনা করা কঠিন হয়, অন্য দেশে তাহা 'অভাব' 'দুষ্প্রাপ্য' অথবা 'দুর্ম্মূল্য' শব্দে প্রকাশ পায়, কিন্তু আমাদের দেশে তাহাকে 'দুর্ভিক্ষ' কহে। আমরা কিছু পাই আর না পাই আহারাভাবে যদি কাহারও মৃত্যু হয় তাহাও বিপদ বলিব না, তাহাতে জাতীয় অনিষ্টও জ্ঞান করি না। কিন্তু যদি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিতে না পারি যদি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমাদের সাধ্য না হয়, সেইটি জাতি সাধারণের বিপদ, সেইটি প্রকৃত কষ্ট। আমরা সেই কষ্ট দুর্ভিক্ষ শব্দে' ব্যাখ্যা করি। দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন, নিরন্নকে অন্নদান, এদেশীয়-দিগের জীবনের সার ধর্ম্ম, তাহার ব্যাঘাত হইলেই মনে যার পর নাই ক্লেশ অনুভব হয়।

কিন্তু সকল গুণেই দোষ আছে, সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধা সর্ব্ব-ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক সোহাগ ও প্রশ্রয় পাইলে সন্তান যেমন নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য হয়, দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের সমাজ ভিক্ষাবৃত্তির অধিক প্রশ্রয় দিয়া অনেক গুলি লোককে সেইরূপ অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিল। যে সনাতন নীতিসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের জ্ঞানবান পূর্ব্ব পুরুষগণ এই উৎকৃষ্ট নিয়মটি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, অপব্যবহারে তাহা এখন সমাজের নিতান্ত অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে। নিম্ন লিখিত বিষয় কএকটী পর্য্যালোচনা করিলে একথা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথমতঃ বৈরাগী ও বৈরাগিনীদিগের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। পূর্ব্বের ন্যায় দণ্ডী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগের পবিত্র ধর্ম্মাচরণ যখন হ্রাস

হইল, সন্ন্যাসীগণ শেষাশ্রমেও 'নিকেতন' প্রাপ্তির প্রয়াস পাইল এবং সন্ন্যাসিনীগণ তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল, তখন এদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। মহাজ্ঞানী, পরমধার্ম্মিক চৈতন্যদেব দেখিলেন, সংসারে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না, গৃহী সংসারের মায়ামোহে সর্ব্বদা পাপকার্য্যে নিরত থাকে, অতএব ধার্ম্মিকের বৈরাগ্য প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন, অনেক ধার্ম্মিক লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। যাহারা গৃহে বাস করিতেন না, অর্থের দাস হইয়া সংসারের পরিচর্য্যা ভাল বাসিতেন না, কেবল ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মানুশীলন করিতেন, তাঁহাদের পবিত্র নাম বৈরাগী ছিল। যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক তাঁহাদিগের মধ্যে এই বৈরাগীর সংখ্যা অধিক হইল, সুতরাং বৈরাগী ও বৈষ্ণব শব্দ মিলিত হইয়া চলিল। তখন বৈরাগী বলিলে পরম পবিত্র ধর্ম্মের ভাব আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইত। কিন্তু কাললীলা আশ্চর্য্য, সময়ের গতি বিচিত্র। এক্ষণে ভিক্ষার্থীর 'ভেক' (কল্পিত বেশ।) যে কালিমা ও কুকর্ম্ম লুক্কায়িত রাখে তাহা মনে হইলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ধর্ম্মের পবিত্র নামের আবরণে বৈরাগী সকল যে সমস্ত কুকার্য্য সাধন করে, তাহা ভাবিতে গেলে ইচ্ছা হয়, যত শীঘ্র ভিক্ষাদান-পদ্ধতি উঠিয়া যায় ততই উত্তম। যে ব্যক্তি নিতান্ত অলস, অনেক দিন সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছে, অর্থাভাবে পরিণয় হইল না, সুতরাং সংসারে প্রবেশ করাও ঘটিল না, সেই বৈরাগী হইল,—বিরাগ ধর্ম্মের জন্য নহে, স্ত্রীলাভার্থ! এদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবা ইচ্ছামত স্বামী লাভ করিতে পারে না, সামান্যা বিধবা রমণীগণ কাজেই সংসারে বৈরাগিনী হয়, এবং এক পা সরিয়া গিয়া ভর্ত্তৃলাভের সহজ উপায় বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এক শ্রেণীতে বালবিধবার সংখ্যা অধিক, অন্য দিকে দরিদ্র যুবকগণ বিবাহ করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির অভাব প্রকারান্তরে পূরণ করিতে বৈরাগী এবং বৈরাগিনীর আবির্ভাব। এই সমস্ত বৈরাগী এবং বৈরাগিনীগণ যে সকল ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ পাপ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। যদি প্রতি সহস্রে একজন বৃদ্ধ বৈরাগী বা বৃদ্ধা বৈরাগিনী সৎপথে থাকে তাঁহাই অধিক। গৃহে থাকার সময় যে অধীনতা ও লোকভয় ছিল, বৈরাগিনী হইলে তাহা আর থাকে না। তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদগৃহ শ্রীবৃন্দাবন যেমন তমালতালী বনশোভিত ললিত-লবঙ্গলতা পরিবৃত রমণীয় নিকুঞ্জবন, মাধবী বকুলাদি কুসুমগন্ধে চারিদিক আমোদিত, বৈরাগিনীদিগের "আশ্রম" অর্থাৎ "আখ্‌ড়া"ও তাহারই অনুকরণ মাত্র। এইরূপ ক্লেশজনক স্থানে, সেতার, এস্রার, তানপুরা প্রভৃতি লইয়া বৈরাগী ও বৈরাগিনীগণ সময় অতিকষ্টে যাপন করেন! ভিক্ষান্নে তাঁহাদের জীবন, সুখ কোথা হইতে আসিবে? কেহ কেহ টপ্পা প্রভৃতি ধর্ম্মগানে দিন যাপন করেন, তাহাতে মাসিক যে কিছু আয় হয়, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন! বাবু লোকের বিচিত্র মহিমা, অপূর্ব্ব রুচি। তাঁহারা ঐ সকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন, বৈরাগিনীদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করেন। যদি কেহ সেই "কৃষ্ণ কথার" প্রতিদান বা মূল্য স্বরূপ সাধারণ নিয়মে তণ্ডুল প্রদান করিতে চাহেন, বৈরাগিনী "ঠাকুরাণী" অমনি বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। এই সকল পবিত্রা তপস্বিনী ও পরমপবিত্র তপসদিগের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় অনেক নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব রহিয়াছে, বালকের পাঠ্য পুস্তকে তাহা সন্নিবেশ করা যায় না। নীতি ও ভদ্রতার অনুরোধে আমরা তাহা লিখিতে অসমর্থ। কিন্তু ধর্ম্মের ভাণ করিয়া যে দুর্ব্বৃত্তগণ ঈদৃশ কুকর্ম্মে প্রশ্রয় পায়, তজ্জন্য হিন্দু সমাজের লজ্জিত হওয়া উচিত। মহাজ্ঞানী পরম ধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষদিগের সাধু নিয়মটী দুর্ব্ব্যবহারে নষ্ট হয় দেখিয়া সকলের তাহা রক্ষার পক্ষে যত্ন করা কর্ত্তব্য! যে পথ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন ছিল, পাপ পিশাচ অলসপ্রকৃতি নরাধমগণ তাঁহার পবিত্রতা নাশ পূর্ব্বক সমাজের যে অনিষ্ট সংঘটন করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে অবহিত হওয়া সকলেরই বিধেয়।

মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সুতরাং নবীনা ললনাগণের তাদৃশ "বিরাগ" জন্মে না। ফকির যত দেখা যায়, মুসলমানদিগের মধ্যে ভিক্ষার্থিনী তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

এক্ষণে আর ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রনিরত নহেন, তাঁহারা সংসারী অপেক্ষাও সংসারী। সমাজের যে মহদুদ্দেশ্য সাধন পূর্ব্বক এত দিন ভিক্ষা লাভের অধিকারী ছিলেন, এখন তাঁহাদের সে অধিকার লোপ হইয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন অথচ যজ্ঞসূত্রধারী, নামে মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা এখন আর সমাজের উপকার হয় না, মহর্ষিগণের পবিত্র সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন আর ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ অথবা নীতিশাস্ত্র রচিত হয় না, যাঁহারা ভিক্ষার্থী তাঁহারা অধিকাংশ নিষ্কর্ম্মা, অলস এবং মূর্খ। ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে সমাজ পূর্ব্বে উপকৃত হইত, সেই কৃতজ্ঞতা দেখানের সময় চলিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য শ্রেণীর লোকমধ্যেও এখন ভিক্ষাবৃত্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজ কল্পতরু, কাহাকেও নিষেধ করে না সুতরাং সুস্থকায়, সবল শরীর গৃহীগণও এখন ভিক্ষার্থী। শত বৎসর পূর্ব্বে 'ভিক্ষায় মানের হ্রাস হয়' এইরূপ একটী ধারণা ছিল, সুতরাং তখন যত ভিক্ষুক ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিত, এক্ষণে তাহাদের সহস্র গুণ অধিক লোকে ভিক্ষাব্যবসায়ী হইয়াছে। সত্য সত্যই ভিক্ষা এমন ব্যবসায়! ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বিক্রয় পূর্ব্বক বৈরাগী প্রভৃতি বিলাসবস্তু ক্রয় করে! মধুক্রমে যেমন কর্ম্মিষ্ঠ মক্ষিকা ব্যতীত অনেক স্থূলকায় নিষ্কর্ম্মা মক্ষিকা থাকে, আমাদের সমাজে ভিক্ষুক সম্প্রদায়ও তদ্রূপ। একেত লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, দেশের আয় এবং উৎপন্ন বস্তু দ্বারা কুলন হয় না, সুতরাং দেশ দরিদ্র। প্রকৃতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, লোকসংখ্যা হ্রাস হউক। তাহাতে আবার এদেশীয় লোকের সহস্র প্রকারে বসিয়া থাকিবার সুযোগ আছে। একজনে উপার্জ্জন করিবে, দশ জন তাহার পোষ্য, সে উপার্জ্জনেও আবার কুটুম্ব, গুরু,

পুরোহিত প্রভৃতির ভাগ আছে। ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপেও অনেকাংশ ব্যয় হয়। ভিক্ষুকদিগের অন্ন যোটাইতে হইবে। এদেশে এই বত্রিশ কোটি লোক-মধ্যে অনুমান দুই কোটি ভিক্ষা ব্যবসায়ী, বিশ কোটি অলস অকর্ম্মণ্য, অবশিষ্ট দশ কোটি লোকে উপার্জ্জন করে, এই দশ কোটি লোকের উপার্জ্জনের উপর বত্রিশ কোটির জীবন।

কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি যে কার্য্যে যাহার সুবিধা বোধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করিলে গড়ে বাৎসরিক এক শত টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে। এই হিসাবে জাতীয় সম্পত্তি মাত্র ভিক্ষুকগণ দ্বারা বৎসর দুই শত কোটি এবং অকর্ম্মা অলস ও ভিক্ষুকগণ কর্ত্তৃক দুই সহস্র দুই শত কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারিত। রুগ্ন কর্ম্মাক্ষম প্রভৃতির সংখ্যা দুই কোটি বিবেচনা করিলেও দুই সহস্র কোটি টাকা অনায়াসেই সমাজের আয় হইত, এই টাকা যখন আয় হয় না, বরং অনেক লোক বসিয়া খায় বলিয়া দ্বিগুণ ক্ষতি।

এই বিষয় গুলির সঙ্গে সঙ্গে একবার বঙ্গদেশের আয় অবস্থা ভাবিয়া দেখ। বাঙ্গালি শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়জীবীদিগের মধ্যে অভিমানের অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখা যায়। বাঙ্গালি বাঙ্গালির জন্য কার্য্য করা অপমান জ্ঞান করে। এজন্য অভাব পূরণে অন্যূন পাঁচ লক্ষ হিন্দুস্থানী লোক এ দেশে আসিয়াছে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বঙ্গদেশকে এই অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে হয়। তাহারা অন্যূন পাঁচ কোটি টাকা উল্লিখিত হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে দেশে লইয়া যায়; সুতরাং দুর্ভিক্ষের অন্যান্য কারণের সহিত আলস্য অভিমান এবং ভিক্ষাবৃত্তি অতি প্রধান কারণ হইয়া উঠে।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে একথা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, আমরা অধিকাংশ স্থলে ভিক্ষা দানে যে পুণ্য সঞ্চয় করি, অলস অকর্ম্মণ্য এবং কুকর্ম্মান্বিত লোকদিগের অলসতা ও ভিক্ষা বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া তদপেক্ষা অধিক পাপে পাতকী হই, সংশয়

নাই। যাহারা প্রকৃত বৈরাগী, যথার্থ উদাসীন, ভারতবাসীর হস্ত তাহাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকুক। যাহারা অন্ধ, পঙ্গু, বা অন্য কোন কারণে জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ, ভারতবাসীর দয়া, জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় সহস্রধারায় তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক। কিন্তু যাহারা অনর্থক কেবল আলস্যের অনুরোধে বা ধর্ম্মের আবরণে কুকর্ম্ম সাধানার্থ পাদপোপরিস্থ উপপাদপের ন্যায় বসিয়া সমাজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করে, তাহাদিগকে কর্ম্ম ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিতে যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পাপের প্রশ্রয়ে তাহাদিগকে মুষ্টিমিত ভিক্ষাদানও মহাপাপ।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

ভীষ্মদেব।

থার্ম্মপলি—থেসিলি এবং গ্রীসদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গিরি-বর্ত্ম। খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে পারস সম্রাট জারেক্সিস্ অগণ্য সৈন্য লইয়া গ্রীসদেশ জয় করণার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইলে, স্পার্টানগরীর রাজা লিওনিদাস, মাত্র তিন শত সৈন্য সহকারে তাঁহার গতিরোধে প্রয়াস পান। তাঁহার চেষ্টা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সফল হয়। দিবাবসান সময়ে একজন গ্রীসদেশীয় লোক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিল, বিপক্ষ-গণকে গুপ্ত আর একটী পথ দেখাইয়া দিল। লিওনিদাস এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলায়ন পূর্ব্বক আপনার এবং সৈন্যগণের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু স্পার্টাবাসিগণ স্বভাবে ক্ষত্রিয়, তাহারা পলায়নে ঘৃণা করিত। মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও কেহ পলায়ন করিল না। সন্ধ্যার সময় পারস্য-সৈন্য তাহাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ দুইদিক হইতে আক্রমণ করিলে লিওনিদাস ও তাঁহার সঙ্গীয়গণ সহস্র সহস্র বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক তাহাদের মৃতদেহো-পরি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। মাত্র একজন লোক প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশীয়গণকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার পলায়নে সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিল।

উত্তরকালে থার্ম্মপলিতে লিওনিদাস এবং তাঁহার সঙ্গীয় বীরগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

ভারতে ভাশা।

তান্তেলস্—গ্রীসদেশীয়গণের দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, তান্তেলস্ আসিয়ামাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়ার অধিপতি ছিলেন। তিনি দেবগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতেন। একদা তিনি দেবগণের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আপন আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য আপন পুত্রকে কাটিয়া দেন। দেবগণ নরমাংস ভক্ষণ করিতেন না। এক জনে ভ্রম বশতঃ তান্তেলসের পুত্রের স্কন্ধদেশ খাইয়া ফেলেন। অনন্তর প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা হস্তীদন্ত দ্বারা স্কন্ধদেশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, এবং তান্তেলসকে তাঁহার এই নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনার জন্য এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, সে জলপূর্ণ সরোবরে বাস করিবে, পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক রহিবে, কিন্তু জলপান করিতে প্রয়াস পাইলে জল দূরে সরিয়া যাইবে, তাহার পিপাসা কখনও প্রশমিত হইবে না।

প্যান্দোরা। ইপিমিথিয়স্—হিন্দু দেব দেবীগণ অসুর বিনাশার্থ যেরূপ তিল তিল সৌন্দর্য্য প্রত্যেকে প্রদান পূর্ব্বক তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন, গ্রীসের দেবগণও প্যান্দোরাকে সেইরূপ সকল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। প্রমিথিয়স্ নামক একজন মনুষ্য আপনার অসাধারণ ক্ষমতা বলে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় বিখ্যাত হইয়া একজন মনুষ্য সৃজন করেন, এবং দেবী এথিনীর সাহায্যে স্বর্গীয় অনল অপহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঐ মনুষ্যের দেহে জীবন সঞ্চার করান। জুপিটর দেব তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শ প্রদর্শন জন্য মৃত্তিকা দ্বারা প্যান্দোরাকে সৃজন করিতে উপদেশ দেন। দেবগণ নানা গুণে বিভূষিত করিলে জুপিটর প্রতিহিংসা লইতে উৎসুক হইয়া তাহাকে প্রমিথিয়সের নিকট পাঠান। প্রমিথিয়স্ জ্ঞানবান্ ছিলেন, তিনি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত

হইলেন না। তাঁহার অজ্ঞান ভ্রাতা ইপিমিথিয়স্ তাহাকে বিবাহ করিল। প্যান্দোরা একটী বাক্স সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহার স্বামী সেই বাক্সটী যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর বাক্স উন্মুক্ত করাতে তাহা হইতে রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, সংসারের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বাহির হইয়া ইপিমিথিয়সকে জড়াইয়া ধরিল। কেবল আশা বাক্স হইতে বাহিরে আসিল না। ইপিমিথিয়স মহাদুঃখী এবং বিক্লত কলেবর হইলেন, কিন্তু আশা তাঁহার জীবনের অবলম্বন রহিল।

এই রূপক দ্বারা গ্রীক কবি দেখাইয়াছেন, অদূরদর্শী কর্তৃক রোগ শোক, পাপ, দুঃখ সমস্ত সংসারে আহূত হয়, জ্ঞানীর নিকট আসিতে পারে না। ললনাগণ যে অনর্থের মূল তাহাও দর্শিত হইয়াছে। প্রমিথিয়স্ সমস্ত মানবজাতির জ্ঞান সমষ্টি, ইপিথিয়স অজ্ঞান সমষ্টি, প্যান্দোরা মানবী সমষ্টি।

দুঃখ সমুদ্রে ভাসমান হইলেও মানবজীবনে আশাই যে প্রধান অবলম্বন, গ্রীককবি তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া প্যান্দোরার দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে।

কেসিভিলেনস্—খ্রীষ্টের জন্মের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রোমের সেনাপতি জুলিয়স সিজর যখন ব্রিটন রাজ্য জয় করিতে গিয়াছিলেন, তখন কেসিভিলেনস্ ইংলণ্ডের পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিতেন। তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা পরাক্রম কিছুই ছিল না। তাঁহার প্রজাগণ নিতান্ত অসভ্য ছিল, তরুকোটরে বাস এবং শরীর চিত্রিত করিত। রাজ প্রাসাদ পর্ণকুটীর ছিল। তিনি রোম-সেনাপতির ঐশ্বর্য্য, পটগৃহের সৌন্দর্য্য এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের এত আছে তোমরা কি এই পর্ণকুটীরের লোভ সংবরণ করিতে পার না?" সিজর আর্দ্র হইলেন এবং কেসিভিলেনস্কে তাঁহার স্বীয় রাজ্যে পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

বার্ক—এদ্ মন্দ বার্ক ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজনীতি বিশারদ, বিচক্ষণ লেখক এবং মহাবাগ্মী ছিলেন। বক্তৃতায় উদ্দীপনা এত অধিক ছিল যে, অনেকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহার ন্যায় বাগ্মী ইংলণ্ডে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচার সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা করেন, আমেরিকার স্বাধীনতা, আর্কটের নবাবের ঋণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন, তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ। ফক্স, সেরিডেন্, গ্রে প্রভৃতি বাগ্মিগণ তাঁহার শিষ্য।

পিট—উয়িলিয়ম্ পিট্ আরল্ অব চেথাম্ ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দেশের প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। তিনি জ্ঞানী এবং একজন প্রধান বাগ্মী ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সপ্ততি বর্ষ বয়সের সময় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা যেমন সুললিত, সারগর্ভ, তেমনই অভিজ্ঞতাপূর্ণ ছিল। বক্তৃতা সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হন, এবং সেই দিবসই মানবলীলা সংবরণ করেন (১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে)।

তাঁহার পুত্র উয়িলিয়ম্ পিট্ ও অতি অল্প বয়সে রাজমন্ত্রী পদে উন্নত হন। ১৭৫৯ সনে তাঁহার জন্ম ১৭৮৩ সনে তিনি ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী। বয়সে অপরিপক্ক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ, এবং বক্তৃতায় বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের প্রথম পরিচয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে স্বদেশীয়গণকে উৎসাহ প্রদান। তাঁহার পিতাও ঐ মত প্রকাশ এবং সকলকে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করিতেন। পুত্র সর্ব্বদা অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে জেদ্ করিয়া ইংলণ্ডকে অস্ত্র ধারণ করান। ফল কাহারও অবিদিত নাই। ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে সন্ধি, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়াবিল প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

সিসিরো—রোমীয় বাগ্মিগণ চূড়ামণি, ইতালীস্থ আর্পীনমে, খ্রীঃ

পূঃ ১০৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ওকালতী ও বিচারকার্য্যে বিশেষ যশোলাভান্তে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সীজর ও পম্পের বিবাদে পম্পের পক্ষ থাকেন। এণ্টনি তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ ৪৩ অব্দে হত্যা করেন।

ডিমস্থিনিস্—গ্রীশদেশীয় পণ্ডিত, এবং প্রাচীনকালের সর্ব্ব প্রধান বাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ৩৮১ অব্দে এথেন্স্ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ ইনি স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, মুখভঙ্গী বিকৃত এবং স্বর নীরস ছিল। এই সমস্ত দোষ দূরীকরণ জন্য লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে কূপ খনন করিয়া সেখানে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন। মুখভঙ্গী সংশোধনার্থ দর্পণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতেন। স্কন্ধের অযথা উন্নত হওয়া নিবারণ করিতে একখানি শাণিত তরবারি স্কন্ধের অব্যবহিত উপরে রাখিতেন। মাসিডনের রাজা ফিলিপ্ এবং তাঁহার পুত্র সেকেন্দর সাহ গ্রীশের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার সময় তাঁহাদের বিরুদ্ধে ডিমস্থিনিস্ যে সমস্ত বক্তৃতা করেন তাহা ভূলোক বিখ্যাত। পরিশেষে স্বাধীনতা রহিল না, শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞানে তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে বিষপান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

কি এবং কেন।

নিউটন্—সর্ আইজাক্ নিউটন্ ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত উলস্থোর্পে জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গণিতের অনেক সত্য উদ্ভাবন করেন। তাঁহার ন্যায় পরিপক্ক লোক এবং সাধুশীল মনুষ্য ইংলণ্ডে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। মাধ্যাকর্ষণের সত্যটি তিনি পৃথিবীর মধ্যে না হইলেও ইয়োরোপের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে উদ্ভাবন করিয়াছি-

লেন। এবং অন্যের অজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব সমস্ত মীমাংসা করিয়া বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞানেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

আর্কিমিদিস্—প্রাচীন কালের সর্ব্বপ্রধান পাশ্চত্য গণিতবিদ্ পণ্ডিত। যখন রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি মার্শেলস্ খ্রীঃ পূঃ ২১২ অব্দে সাইরাকিয়ুজ্ নগরী আক্রমণ করেন, তখন উল্লিখিত বিজ্ঞান বিশারদ্ আর্কিমিদিস্ নগরীর দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নানা রূপযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষগণের অবরোধ চেষ্টা ব্যর্থ করেন। কাচ দ্বারা একরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ছিলেন যে, বিপক্ষগণের অর্ণব-তরীর সম্মুখে তাহা স্থাপন করিলে তাহা হইতে অগ্নি বাহির হইয়া জাহাজ ভস্ম করিয়া ফেলিত। একদা তিনি একটি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা উপপন্ন করিতে ছিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। ইতিমধ্যে রোমীয়-গণ দুর্গভেদ করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ও হত্যা করিতে লাগিল। এক জন সামান্য সৈন্য জয়োন্মত্ত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ প্রবেশ করিল এবং শাণিত তরবার তাঁহার মস্তকোপরি উত্তোলন করিয়া বধার্থ উদ্যত হইল। তিনি বলিলেন "অপেক্ষা কর, আমি এটি প্রমাণ করিয়া লই।" মূর্খ তাহা বুঝিল না, তাঁহার মস্তক তৎক্ষণাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। আর্কিমিদিসের বাটী এবং তাঁহার জীবন রক্ষার্থ রোম সেনাপতি সর্ব্বসাধারণের প্রতি ঘোষণা প্রচার করিয়া ছিলেন। মূর্খ চিনিতে না পারিয়া জগতের এই মহান্ অনিষ্ট সাধন করিল।

রাজা হাইরোর মুকুট আশ্চর্য্য প্রণালীতে ওজন করাতে আর্কিমি-দিস্ বিলক্ষণ যশস্বী হন। তিনি বলিতেন আমার যন্ত্র স্থাপনের উপ-যুক্ত স্থান দেও, আমি সমস্ত পৃথিবী আন্দোলিত করিব। যাঁহারা বিজ্ঞা-নের ক্ষমতা জানেন তাঁহারা এ কথা অসম্ভব বোধ করিবেন না।

হেলেনের রূপানলে ভস্মীভূত ইত্যাদি। হেক্টর—বর্ত্তমান সময়ের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আসিয়ামাইনরের অন্তর্গত ট্রয়

নগরী ঐশ্বর্য্য এবং পরাক্রমে বড বিখ্যাত হইয়া উঠে। প্রায়াম্ ঐ নগরীর রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হেক্টর অতি প্রধান বীর ছিলেন। একদা প্রায়ামের কনিষ্ঠ পুত্র পেরিসের নিকট জুনো, মিনর্ব্বা এবং ভিনস্‌দেবী উপস্থিত হইয়া কে অধিক সুন্দরী ?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জুনোকে সুন্দরী বলিলে ঐশ্বর্য্য, মিনর্ব্বাকে বলিলে বিদ্যা এবং ভিনস্‌দেবীকে বলিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়। বালক পেরিস্ এই শেষোক্ত বর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে ভিনস্ দেবীকে অধিক সুন্দরী বলিলেন। তদবধি জুনো এবং মিনর্ব্বা তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে, আর ভিনস্ আপন প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ট্রয়ের রাজপরিবারের একটি কন্যাকে গ্রীশের দেব-দেব জুপিটর অপহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধানার্থ পেরিস্ গ্রীশে প্রেরিত হন। তিনি স্পার্টা নগরীর রাজা মেনিলসের গৃহে অতিথি স্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুপস্থিতি সুযোগে তাঁহার পত্নী হেলেন্‌কে অপহরণ করেন। দেবযোনিসম্ভবা হেলেন সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী ছিলেন। ভিনস্ দেবীর প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

অনন্তর তাঁহারা ট্রয়ে উপস্থিত হইলে মেনিলস্ প্রভৃতি জ্ঞানীগণকে সমভিব্যাহারে ট্রয় অবরোধ করেন। দ্বাদশ বৎসর নগরী অবরুদ্ধ থাকার পর গ্রীশ বাসিগণ নগরী প্রবেশ করে, এবং ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ট্রয় ভস্মীভূত হইয়া যায়। উভয় পক্ষের অধিকাংশ বীর নির্ম্মূল হয়। হেলেনের সৌন্দর্য্যই এই সর্ব্বনাশের মূল।

গালিলিও—ইতালির প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত। ইনি ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে পাইসা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীনতম তাপমান যন্ত্র, দূরবীক্ষণ, ঘটিকা যন্ত্রের দোলক প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া গালিলিও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৃথিবী ঘুরিতেছে, সূর্য্যের গতি নাই, এই সত্য তিনিই ইযোরোপে প্রথম উদ্ভাবন করেন। এই

ধর্ম্ম বহির্ভূত কথার জন্য কারারুদ্ধ হইবার সময়, রোমে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া বলিয়াছেন "এখনও পৃথিবী ঘুরিতেছে।" কারামোচনান্তে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে অন্ধ হইয়া ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

আর্‌ক্রাইট—সর্‌রিচার্ড আর্‌ক্রাইট্ প্রথমতঃ ক্ষৌরকারের কার্য্য করিতেন। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার বাসনা জন্মিল। পরিশেষে একজন যন্ত্র নির্ম্মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সূতাকল প্রস্তুত আরম্ভ করেন। দুই তিন বার অকৃতকার্য্য হইয়া পরে তাঁহার মনোরথ সংসিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান সূতাকল তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের উন্নতি মাত্র। তিনি ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজার নিকট "সর্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

হোমার—গ্রীশ দেশের সর্ব্ব প্রধান কবি। ইলিয়াদ্ নামক মহাকাব্য ইঁহার রচিত। সাত স্থানের মধ্যে ইহাঁর জন্ম সম্বন্ধে বিবাদ আছে, কোন স্থানে জন্ম তাহা নির্ণয় হয় না। ইনি কাব্য রচনা করিয়া গান করিতেন, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ইনি অন্ধ ছিলেন।

নৈশ-নিস্বর্গ।

ডন্‌ক্যান্, ম্যাক্‌বেথ্—ডনক্যান স্কটলণ্ডের রাজা ছিলেন। একদা তাঁহার প্রধান সেনাপতি ম্যাক্‌বেথ্ তাঁহাকে আমোদ প্রমোদ করা ব্যপদেশে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ম্যাক্‌বেথের দুরাশা যে রাজাকে হত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করে। তাহার নিষ্ঠুরা স্ত্রী এই নৃশংস ব্যাপারে উৎসাহ দায়িনী ও সাহায্যকারিণী ছিল। ডন্‌কান্ নিদ্রিত ছিলেন। নিশীথ সময়ে তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশপুর্ব্বক ম্যাক্‌বেথ্ তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত করে। ম্যাক্‌বেথের দুরাশা সফল হয় নাই। তাহার এবং তাহার

স্ত্রীর পরিণাম শোচনীয়। জগদ্বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি সেক্ষপিয়র্ এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন।

সেক্‌ষ্টস্, লুক্রিসী—অত্যাচারী রোম সম্রাট্ টার্কুয়িনিয়সের কুলাঙ্গার পুত্র সেক্‌ষ্টস্ তাহার খুল্লতাত ভ্রাতা লুক্রিসিয়সের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার পত্নী রূপবতী লুক্রিসীর প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করে। তিনি পতিপরায়ণা ও পরম গুণবতী ছিলেন। সেই শোচনীয় বিভৎস ঘটনার রজনী প্রভাত হইলে লুক্রিসী আপন স্বামী ও শ্বশুরকে আলয়ে আনাইয়া আপন অপমান প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিহিংসা লইতে প্রতিশ্রুত করাইয়া বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রদান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় ঘটনায় রোমের সমস্ত লোক এক পক্ষ হইলে, সেক্‌ষ্টস্ ও টার্কুয়িনিয়স্ পলায়ন করে, রোমে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপিত হয়।

নিরো—নিরো ক্লদিয়স্ সিজর্ রোমরাজ্যের সপ্তম সম্রাট। ইনি ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। একপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ঘৃণিতস্বভাব নরাধম কখনও কোন রাজ্যের সিংহাসন কলঙ্কিত করা ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ইনি যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তখন ইঁহার মাতা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরিশেষে মাতার হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ লালসায় তাঁহাকে হত করেন। ইনি আমোদের জন্য গ্রামদগ্ধ, এবং নর হত্যা করিতেন। ৬৮ খ্রীঃ অব্দে পাপদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার মোচন করেন।

চিতোর নগরী।

সেকেন্দর সাহ—মহান্ আলেকজেন্দার। গ্রীশ দেশস্থ মাসিডনের রাজা ফিলিপের পুত্র। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৫৫ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ভুবনবিখ্যাত মহাবীর সমগ্র গ্রীশ, এবং পারস-সাম্রাজ্য

অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পুরু নামক প্রসিদ্ধ রাজার সহিত ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হন, এবং পুরুকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে বাবিলন্ নগরীতে জ্বররোগে খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

সিস্ট্রীস্—সিথস্ বা রামিসেস্ প্রাচীন মিশর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। ইনি পালস্তিন্, সিথিয়া, থ্রেস্, ইথিওপিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী রাজা সকল অধিকার করেন। ইনি যুদ্ধে যে সমস্ত বন্দী গ্রহণ করেন, তাহাদিগদ্বারা শত শত পয়ঃ-প্রণালী খনন করাইয়া মিশর দেশ চিত্র বিচিত্র করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে দেশ তাদৃশ উর্ব্বরা ছিল না। ইনি আরবদেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। শত শত কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহার কীর্ত্তি খোদিত ও লিখিত আছে। খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

সেমিরামিস্—রাজ্ঞী সেমিরামিস্ আসিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট্ নাইনসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহার ন্যায় বুদ্ধি এবং রণকৌশল-সম্পন্না ললনা প্রাচীন কালেও অধিক ছিলেন না। ইনি বাবিলন্ নগরী শত শত অট্টালিকা দ্বারা এরূপ সুশোভিত করেন যে, ঐ নগরী ইঁহারই নির্ম্মিত বলিয়া অভিহিত হইত। ইঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নাইনস্ অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইনি মিশর, ইথিওপিয়া অধিকার পূর্ব্বক ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া বসেন। খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে ইনি প্রাদুর্ভূতা হন।

সিজর্—কেইয়স্ জুলিয়স্ সিজর্ খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে ইতালীদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় গণিতবিদ্ পণ্ডিত এবং রণকুশল সেনাপতি তৎকালে আর ছিল না। ইনি গলরাজ্য জয় করণার্থ প্রেরিত হইয়া নয় বৎসরে সমস্ত ইউরোপ এবং ইংলণ্ড জয় করেন।

অনন্তর রোমাভিমুখে অগ্রসর হইলে রাজ্যের প্রধান লোক সকলে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠে। তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া সকলে পলায়ন করে। তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ পূর্ব্বক হত করেন। ক্রমে আফ্রিকার উত্তর ভাগ এবং পশ্চিম আসিয়া তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এবং কঠিন শাসনে সমস্ত রাজ্য নত রহে।

অনন্তর তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ব্রুটস্ প্রভৃতি কতকগুলিন লোক তাঁহাকে বিনাপরাধে হত করে। খৃঃ পূঃ ৪৩ অব্দে।

হানিবল্।—কার্থেজ রাজ্যের প্রসিদ্ধ সেনাপতি খৃঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা হামিল্‌কার্ তাঁহাকে দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া রোমের সহিত চির-শত্রুতা করিতে প্রতিশ্রুত করান। হানিবল্ অল্প বয়সে স্পেইনদেশে রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ক্রমে প্রায় সমগ্র দেশ অধিকার করাতে রোমীয়গণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করা হইল বলিয়া আপত্তি করিতে থাকে। 'তবে আমি ইতালী অধিকার করিব' এই বলিয়া দুরতিক্রম্য আল্পাগিরি অতিক্রম পূর্ব্বক ইতালী আক্রমণ করিয়া বসেন। ক্রমে চারিটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রোম রাজ্যে ভীতি উৎপাদন করেন। শেষ যুদ্ধ "কেনি" নামক স্থানে রোমের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। তখন রোমে প্রবেশ করিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু হানিবলের স্বদেশীয়গণ তাঁহার যশোগীত শ্রবণে ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া সাহায্য প্রেরণে বিরত রহিল। অনন্তর রোমীয়গণ আফ্রিকায় গমন পূর্ব্বক কার্থেজ্ আক্রমণ করিয়া বসিলে হানিবল প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাগত হইয়া "জামার" যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়াতে কার্থেজের বল এক বারে ক্ষয় হইল। হানিবল অকৃতজ্ঞ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। পরিশেষে নানারূপ দুঃখ দুর্দ্দশার পর বিষ পান করিয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইলেন। খৃঃ পূঃ ৮ অব্দে।

নেপোলিয়ন্—বোনাপার্টি,প্রথম নেপোলিয়ন, ফ্রান্সের সম্রাট্। তিনি কর্সিকা দ্বীপের অন্তর্গত এজেসিও নগরীতে ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অবস্থা সামান্য ছিল, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপরিসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর সৈনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিয়া টৌলনের অবরোধ সময়ে আপনার সমর কৌশল প্রথম প্রকাশ করেন। ইংরেজদিগকে দুরীভুত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলে, তিনি সেনাপতির পদে উন্নত হইলেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইল, ক্রমে অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। পরিশেষে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হইলেন। (১৮০৪ খৃঃ অব্দে)। অষ্টারলিজের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে এক দিনে ইংলণ্ড, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মিলিতবল চূর্ণ করিলেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জিনার যুদ্ধে প্রুশিয়ারাজ্য পদমর্দ্দিত করিলেন। রুশিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক সম্রাটকে সন্ধি করিতে বাধ্য করাতে সমস্ত ইউরোপ কম্পিত হইয়া উঠিল। মিশর অধিকৃত হইল, ভারতবর্ষে টিপু সুলতানকে 'অত্যাচারী ইংরেজের' হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশ্বাস পূর্ণ পত্র লিখিলেন। স্বয়ং কল্পতরু হইয়া আত্মীয় স্বজনকে দুইহস্তে রাজ্য-বিভাগ করিয়া দিতে লাগিলেন।

১৮১২ খৃঃ অব্দে কুক্ষণে পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া রুশিয়ায় প্রবেশ করিলেন। তিনি মস্কো নগরীতে উপস্থিত হইলে রুশসম্রাট সমস্ত গৃহ ও শস্য ক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিয়া পলায়ন করাতে, শীতে, তুষারে এবং অনাহারে অধিকাংশ শিক্ষিত সৈন্য বিনাশ পাইল।

প্রত্যাগত হইবা মাত্র রুশিয়া, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন্ এবং জর্ম্মণি যুগপৎ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। নেপোলিয়ন্ সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুজেন, বোজেন, এবং ড্রেস্‌ডেন্ নগরীতে তাহাদিগকে পরাস্ত এবং জর্ম্মণিকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাজ্য শান্তিহীন দেখিয়া দেশস্থ সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলে সম্রাট্ নেপোলিয়ন্ সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে এল্বা দ্বীপে গমন করিলেন (১৮১৪ খৃঃ অব্দে)। বৎসরেক কাল বোর্ব্বণ পরিবারের রাজগণ রাজত্ব করিলে পর, পুনরায় তিনি ফ্রান্সে সমাগত হইবা মাত্র সকল সৈন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইল। নেপোলিয়ন্ লিগ্নীতে প্রুশিয়ার সম্রাট্কে পরাস্ত করিলেন। পরিশেষে দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই জুন ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সেনানী ওয়েলিংটন্ এবং প্রুশিয়ার সেনাপতি ব্লচারের নিকট পরাস্ত হইয়া রজনীতে পলায়নের প্রয়াস পান। তাঁহার বাসনা ছিল যে, আমেরিকায় গমন করেন। কিন্তু দেশের লোক ও বিপক্ষ, পলাইতে পারিলেন না। এক জন ইংরেজ জাহাজের কাপ্তানের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। সে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেন। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে একটি বিস্ফোটকে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়নের ন্যায় মহাবীর, আধুনিক পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করে নাই, তিনি যেমন বীর, গণিতবিদ্, তেমনই রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যুদ্ধ প্রণালী সংগ্রাম শাস্ত্রের এবং আইন সকল সভ্য পৃথিবীর ব্যবহার শাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ।

ওয়েলিংটন্—আর্থার্ ওয়েস্লি, পরিশেষে ডিউক্ অব ওয়েলিংটন্, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন ইহার ভ্রাতা মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্লি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তখন ইনি সেনাপতির পদে ব্রতী হইয়া টিপু সুলতান এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং শ্রীরঙ্গপত্তন, আসাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হন। ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেন। পরিশেষে দীর্ঘ জীবন পরম সুখে অতিবাহন করিলে ১৮৫২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়েলিংটন, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি মহাবীরের ন্যায় দক্ষ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার মত সৌভাগ্যশালী সেনাপতি আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

মারল্‌বরো—জন্ চার্চ্চিল্ পরিশেষে ডিউক অব্ মারল্‌বরো, ১৬৫০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডিভন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভাল লেখা পড়া জানিতেন না। বাল্যকালে ডিউক্ অব্ ইয়র্কের ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহার চারি বৎসর পর শরীর রক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হন। মোরোক্কোর অন্তর্গত তাঞ্জিয়ার অবরোধে ইনি প্রথমতঃ সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ক্রমে সেনাপতির পদে উন্নত হইয়া মেষ্ট্রিষ্ট্ অবরোধে, মন্‌মাউথের বিদ্রোহ নিবারণে, ফ্রান্স ও স্পেইনের সহিত সংগ্রামে বিলক্ষণ যশস্বী হন। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ব্লেন্‌হেমের, ১৭০৬ খৃঃ অব্দে রেমিলিসের, এবং ১৭০৯ খৃঃ অব্দে মল্‌প্লেকোয়েটের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তৎকালে অদ্বিতীয় সেনাপতি স্বরূপ গণ্য হন। পরিণামে ডিউক অনেক দিন বিদেশে অতিবাহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া উন্মাদ অবস্থায় ১৭২২ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন।

ওয়াসিংটন্।—জর্জ্জ ওয়াসিংটন আমেরিকার অন্তর্গত ভর্জ্জিনিয়া প্রদেশে ১৭৩২ খৃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু জর্জ্জের একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার পরলোক হওয়াতে তিনি জর্জ্জকে ভাল লেখা পড়া শিখাইয়া যাইতে পারেন নাই। জর্জ্জ আপন চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করেন এবং গণিত-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। ঊনবিংশবর্ষ বয়সের সময় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি ফরাসী সৈন্য পরাজয় করেন। অনন্তর ইংলণ্ড আমেরিকার মধ্যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে ওয়াসিংটন প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে আমেরিকা ও

ওয়াসিংটনের ইতিহাস এক এবং অভেদ। হাউ, ক্লিন্টন, বার্গয়েন, কর্ণওয়ালিস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণ অনেকবার তাঁহার নিকট পরাভূত হন। আমেরিকা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে। সৈন্য-গণের শিক্ষাদান হইতে আরম্ভ করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য তাঁহার দ্বারা সংসাধিত হয়। তিনি অনেকবার কঙ্গ্রেস সভার সভাপতি হন। তাঁহার নামানুসারে রাজধানীর নাম ওয়াসিং-টন রহে। তিনি অবসর সময়ে আপন পৈতৃক সম্পত্তিতে কৃষিকার্য্য করাইতেন। একপ উন্নত অবস্থায় তাঁহার ন্যায় সৎ, নিঃস্বার্থ, স্বদেশ হিতৈষী, উদার চরিত্র, ক্ষমাশীল ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ওয়াসিংটন্ আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভার্ণন্ পর্ব্বতে মানবলীলা সংবরণ করেন।

রিয়েন্‌জী—শেষ রোমীয় প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা। রোম রাজ্যের অধঃপতন হইলে ১৩১০ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কুলীনগণ সাধারণের প্রতি একপ অত্যাচার আরম্ভ করেন যে, রিয়েন্‌জী আর সহ্য করিতে না পারিয়া জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহার অনলবর্ষি বক্তৃতায় সকলে উত্তেজিত হইয়া ভীষণ সংগ্রামে কুলীন-গণকে পরাজিত করে। পুনরায় রোমে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রিয়েন্‌জী জনসাধারণের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিছুদিন গত হইলে যখন প্রয়োজনীয় করাদি সংগ্রহের আবশ্যক হইল, সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, সেই সুযোগে কুলীনগণ রিয়েন্‌জীকে পরাস্ত এবং তাঁহাকে তাঁহার আপন গৃহে ভস্মীভূত করি-লেন, (১৩৫২ খৃঃ অব্দে)। তিনি অতিশয় দেশবৎসল, সুশিক্ষিত এবং মহাবাগ্মী ছিলেন।

হারূনলরসিদ (খলিফা)—সমস্ত আরব, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরাক্রান্ত সম্রাট। কথিত আছে, তিনি এরূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, তৎকালে জ্ঞানী ও বিদ্বান্ বলিলে মাত্র

তাঁহাকেই বুঝাইত। সুশাসন জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক আরবী ও পারসী কাব্যে এবং আরব্য উপন্যাসে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ্ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন।

মাবাথন্—এথেন্স্ নগরী হইতে ২০ মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র পল্লী। এই স্থানে খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে পারস্য-সম্রাটের প্রেরিত সৈন্য-গণকে গ্রীক্ সেনাপতি মিল্‌তাইদেস্ বিলক্ষণ রণকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরাস্ত করেন।

লিওনিদাস্—থার্ম্ম পলি দেখ।

সমাপ্ত।